হারুকি মুরাকামি

পিনবল, ১৯৭৩



অনুবাদ
আলভী আহমেদ

হারুকি মুরাকামি

পিনবল, ১৯৭৩

অনুবাদ

আলভী আহমেদ

ঢাকা । চট্টগ্রাম । সিলেট । বাংলাবাজার

পিনবল হলো এমন এক খেলার মেশিন যেখান থেকে কখনোই কিছু জেতা সম্ভব নয়। এটা খেলে কিছু সময় কাটানো যেতে পারে। টাকা অপচয়ের এক অনবদ্য মাধ্যম হলো পিনবল। মেশিনটা থেকে শুধু একটা জিনিসই অর্জন করা যায়। আর তা হচ্ছে, কোনো কিছুকে ডেসিমালে প্রকাশ করতে শেখা।

সে তুলনায় এটা খেলতে গিয়ে আপনি যা যা হারাতে পারেন, সেই তালিকাটা বেশ দীর্ঘ। যে পরিমাণ কয়েন আপনি এই মেশিনে হারবেন, তা দিয়ে মোটামুটিভাবে আমেরিকার সব প্রেসিডেন্টের একটা করে আবক্ষ মূর্তি দাঁড় করানো সম্ভব।

পিনবল জিনিসটাই এমন। এটা আপনাকে কোনো গন্তব্যে পৌঁছে দেবে না। এর মাত্র একটাই গন্তব্য থাকতে পারে। তা হচ্ছে, আপনি হারবেন এবং হারার পর আপনার জেদ চাপবে। তখন আবার খেলবেন। প্রতিবার খেলা শেষে, রিপ্লে লাইটটা জ্বলে উঠবে আর আপনি নতুন করে খেলতে শুরু করবেন। খেলতে খেলতে একসময় এটাও আপনার মনে হতে পারে যে পিনবল খেলার উদ্দেশ্যই হচ্ছে শুধু খেলার জন্য খেলা।

আপনার কখনোই মনে হবে না, এটা খেলে আপনি সময়ের নিদারুণ অপচয় করছেন। কখনোই আপনার মধ্যে কোনো আত্মোপলব্ধি জাগবে না। তবে বিদ্রোহ জাগতে পারে। আপনার মধ্যে যে অহংকারটুকু আছে, হারতে হারতে সেটুকু নিভে যাওয়ার খানিকটা সম্ভাবনা আছে। একসময় এমনও মনে হতে পারে যে হারার জন্যই এই পৃথিবীতে আপনার জন্ম হয়েছে।

হারুকি মুরাকামি

ভূমিকা

হারুকি মুরাকামির দ্বিতীয় উপন্যাস *পিনবল, ১৯৭৩*। তিনি *হিয়ার দ্য উইন্ড সিং*-এর ঠিক পরপর লেখেন এই উপন্যাস। জাপানি ভাষায় ১৯৮০ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। সেই হিসেবে *হিয়ার দ্য উইন্ড সিং* যদি হয় একটা পাখির উড়তে শেখা, *পিনবল, ১৯৭৩* হলো আকাশে ডানা মেলে দেওয়া।

প্রথম দুটো উপন্যাস দীর্ঘদিন পর্যন্ত ইংরেজিতে অনুবাদ করার অনুমতি দেননি মুরাকামি। মজার ব্যাপার হলো, *পিনবল, ১৯৭৩*-এর ইংরেজি অনুবাদই বাজারে আগে আসে। সেটা ১৯৮৫ সালের কথা। আলফ্রেড ব্রিনব্যুমকে ইংরেজিতে অনুবাদ করার অনুমতি দেন মুরাকামি। এরপর বিভিন্ন অনুবাদক নিজেদের মতো করে অনুবাদ করেছেন উপন্যাসটা।

আমি যাঁর ইংরেজি অনুবাদ থেকে এই উপন্যাসটা বাংলায় ভাষান্তর করেছি, তিনি হলেন টেড গুসন। মুরাকামির অনেক লেখাই তিনি অনুবাদ করেছেন। ২০১৫ সালে পেঙ্গুইন থেকে *Wind / Pinball* শিরোনামে তাঁর প্রথম দুটি উপন্যাস এক মলাটে ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়। আমার অনুবাদের রেফারেন্স হিসেবে এই সংস্করণটা বেছে নেওয়ার কারণ হলো, এই সংস্করণে হারুকি মুরাকামি আদি উপন্যাসটাতে কিছু পরিবর্তন এনেছেন। তা ছাড়া টেড গুসন একটু সহজ ভাষায় লেখেন। তরতর করে পড়া যায়, বুঝতেও সুবিধা। তাঁর নিজের বোঝার মধ্যে কোনো অস্পষ্টতা নেই। তাই পুরো ব্যাপারটা অন্যকে সহজে বোঝাতে পারেন।

যদিও মুরাকামি *পিনবল*কে প্রথম উপন্যাসের সিক্যুয়েল বলেছেন, তবু উপন্যাসটা পড়তে গিয়ে আগেরটা পড়ে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই। প্রধান চরিত্রগুলো আগের উপন্যাসটা থেকে টেনে আনা। কিন্তু সেটুকুই। চরিত্র এবং গল্প এই উপন্যাসেই স্বয়ংসম্পূর্ণ। গল্পে ঢুকে যাওয়ার জন্য আগের উপন্যাসের

গল্পসূত্রের তেমন কোনো প্রয়োজন নেই। শার্লক হোমসের যেকোনো গল্পেই যেমন প্রধান চরিত্রগুলো একই, কিন্তু গল্পটা আলাদা, ঠিক সে রকম।

নামহীন এক যুবক এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। তার সঙ্গে আছে বন্ধু র‍্যাট। *হিয়ার দ্য উইন্ড সিং*-এর আরেকটা চরিত্র চায়নিজ বারটেন্ডার জে-ও উপন্যাসে প্রবল প্রতাপে উপস্থিত। মুরাকামির চারটা উপন্যাসে আছে র‍্যাট চরিত্রটি। প্রথম দুটোর নাম আপনারা ইতিমধ্যেই জানেন। তৃতীয়টা হলো *আ ওয়াইল্ড শিপ চেজ*। এই তিনটা বইকে একসঙ্গে বলা হয় র‍্যাট ট্রিলজি।

মুরাকামির ইচ্ছে ছিল, এখানেই শেষ করে দেবেন র‍্যাটের গল্প। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মত বদলান তিনি। *ডান্স ডান্স ডান্স* নামে চতুর্থ উপন্যাসটিও লিখে ফেলেন দীর্ঘ বিরতি দিয়ে।

এই চারটির মধ্যে প্রথম দুটো উপন্যাস *হিয়ার দ্য উইন্ড সিং* এবং *পিনবল, ১৯৭৩* আমি অনুবাদ করলাম বাংলায়। পাঠক যদি চরিত্রগুলোকে আপন করে নেয়, বাকি দুটো উপন্যাসও অনুবাদ করার ইচ্ছা আছে।

আলভী আহমেদ

ঢাকা, জুলাই ২০২০

alviahmed821@gmail.com

১৯৬৯-১৯৭৩

আমি গল্প শুনতে ভালোবাসি। দূরদূরান্তের মানুষের গল্প শুনি। এটা আমার একধরনের রোগ বলা যায়।

দশ বছর আগেকার কথা। তখন আমি ডেকে ডেকে মানুষকে জিজ্ঞেস করতাম, তারা কোথায় জন্ম নিয়েছে, কীভাবে বেড়ে উঠেছে। সবকিছুর মধ্যেই একটা গল্প খুঁজতে চাইতাম। সে সময় ভালো শ্রোতার নিশ্চয়ই বেশ অভাব ছিল। মানুষ বলতে চাইত, কিন্তু শোনার মতো লোক ছিল না। আমি যার কাছেই গল্প শুনতে চাইতাম, সে খুব আগ্রহ নিয়ে আমাকে গল্প বলতে শুরু করত।

আমি যে মানুষের কাছে গল্প শুনে বেড়াই, এই ব্যাপারটা কী করে যেন চারদিকে রটে গেল। লোকজন দূরদূরান্ত থেকে আমার কাছে গল্প বলতে আসত। এমনকি যাদের আমি জীবনে চোখেও দেখিনি, তারাও একসময় আসতে শুরু করল।

অনেকখানি সময় নিয়ে মানুষ তাদের গল্পগুলো আমাকে বলত। বলার সময় তাদের ভেতরের বিভ্রান্তিটুকু আমি টের পেতাম। ওটা আদৌ কোনো গল্প হয়ে উঠছে কি না, সে ব্যাপারে নিশ্চিত না হলেও, গল্পের ছোট-বড় সব অংশই তারা গড়গড় করে বলে যেত। মনে হতো, তারা একটা শুকনো কুয়ার মধ্যে পাথর ফেলছে। আর এটা করতে পেরে একধরনের তৃপ্তি নিয়ে বাড়ির পথ ধরত।

নানান রকমের মানুষ ছিল তখন। কেউ কেউ গল্প বলতে বলতে তার মধ্যে যেন একেবারে ডুবে যেত, আবার কেউ প্রচণ্ড রেগে উঠত। কিছু গল্প ছিল খুবই সোজাসাপটা, আর কিছু ছিল জটিল ধরনের। কোনোটা আবার একেবারে আগামাথা ছাড়া। কিছু গল্প ছিল খুব আজব এবং বিরক্তিকর, কিছু সার্কাস্টিক

এবং উদ্ভট। আমি সবগুলো গল্পই খুব মন দিয়ে শোনার চেষ্টা করতাম।

কোনো এক অদ্ভুত কারণে মানুষ গল্পগুলো বলার জন্য ব্যস্ত হয়ে ছিল। কাউকে না কাউকে তারা সেগুলো বলতে চাইত। সেটা কোনো নির্দিষ্ট মানুষকে হতে পারে, অথবা সমস্ত পৃথিবীকে। বুকটা হালকা করা তাদের খুব প্রয়োজন ছিল। তারা চিৎকার করে গল্পগুলো বলতে চাইত। তাদের এই আকুতির মধ্যে আমি খাঁচাভর্তি বানরের ছবি দেখতে পেতাম।

ধরুন, খাঁচাভর্তি কিছু বানরকে খাঁচা খুলে কোনো একটা মাঠে ছেড়ে দেওয়া হলো। তখন তারা বিপুল উৎসাহ নিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে। এলোমেলোভাবে ঘোরাফেরা করবে। এভাবে ঘুরতে ঘুরতে তারা বেঁচে থাকতে পারে, আবার একসময় দূরে হারিয়ে যেতে পারে বা মরে যাওয়াও বিচিত্র কিছু নয়। হয়তো এটাই তাদের নিয়তি। গল্পগুলোও তাদের ভেতরের খাঁচা থেকে বের হওয়ার জন্য একরকম অস্থির হয়ে ছিল।

সত্যি কথা বলতে কি, আমার জন্য পুরো ব্যাপারটাই ছিল বেশ পরিশ্রমের। মানুষের কথা মন দিয়ে ধৈর্য ধরে শোনার মধ্যে এক ভয়াবহ ক্লান্তি আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনো ফল পাওয়া যায় না। খাটুনিটুকু একেবারে বৃথা যায়। সে সময় পৃথিবীতে যদি মন দিয়ে গল্প শোনার একটা প্রতিযোগিতা আয়োজন করা যেত, নিশ্চিতভাবে আমি ফার্স্ট প্রাইজ পেতাম। এবং পুরস্কার হিসেবে তারা আমার জন্য সম্ভবত এক বাক্স দেশলাই বরাদ্দ করত।

গল্পগুলো কতটা আজব ছিল, দুটো উদাহরণ দিলেই আপনারা বুঝতে পারবেন। তাদের একজন দাবি করেছিল, সে এসেছে সৌরজগতের ষষ্ঠ গ্রহ শনি থেকে। আরেকজন বলেছিল যে তার বাড়ি দ্বিতীয় গ্রহ ভেনাসে, যার আরেক নাম শুক্র। ভেনাস থেকে আসা ছেলেটার গল্প যথাসময়ে আসবে। শনি গ্রহের ছেলেটার গল্প প্রথমে বলি।

'ভয়ংকর ঠান্ডা সেখানে। আমরা একদম পাগল হয়ে যেতাম', সে মাথা নেড়ে ধীরে ধীরে কথাগুলো বলেছিল আমাকে।

শনি গ্রহে আসলে কেমন ঠান্ডা, সেটা যাচাই করার কোনো উপায় জানা ছিল না আমার। তবে এটুকু জানতাম যে ছেলেটা আসলে আমাদের ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের ৯ নম্বর বিল্ডিংয়ে থাকত। একটা রাজনৈতিক দলের সক্রিয় কর্মী ছিল সে। তাদের দলের মূলনীতি ছিল, 'কর্মই মানুষের আদর্শ ঠিক করে দেয়। আদর্শ কর্ম ঠিক করতে পারে না।' যদিও কর্ম বলতে তারা আসলে ঠিক

কী বোঝাতে চেয়েছিল, সেটা আমার কাছে পরিষ্কার নয়। আমি ছেলেটাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। সে নিজেও ঠিকমতো বুঝিয়ে বলতে পারেনি।

৯ নম্বর বিল্ডিংয়ে ওয়াটার কুলার, টেলিফোন, পানি গরম করার বয়লারসহ প্রায় সব আধুনিক সুযোগ-সুবিধা ছিল। দোতলায় তাদের মিউজিক লাউঞ্জ। প্রায় দুই হাজার রেকর্ডের কালেকশন সেখানে। সেগুলো তারা এলটেক কোম্পানির 'এ ফাইভ' স্পিকারে শুনত। ক্যাম্পাসের অন্য বিল্ডিংগুলোর তুলনায় সেটা ছিল রীতিমতো একটা স্বর্গ। ৮ নম্বর বিল্ডিংয়ের সামনে দিয়ে তো চলাফেরাই করা যেত না। পাবলিক টয়লেটের মতো দুর্গন্ধ ভেসে আসত সেটা থেকে।

প্রতিদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ৯ নম্বর বিল্ডিংয়ের ছেলেরা গরম পানি দিয়ে দাড়ি কামাত। সারা দিন ফিটফাট হয়ে ঘোরাঘুরি করত ক্যাম্পাসে। তারপর বিকেলের দিকে ডর্মে ফিরে এসে ইচ্ছামতো লং ডিসট্যান্স ফোনকল। সন্ধ্যায় মিউজিক লাউঞ্জে বসে একসঙ্গে গান শুনত। কিছুদিনের মধ্যেই তারা একেকজন ক্ল্যাসিক্যাল সংগীতের বেশ বড় সমঝদার হয়ে উঠল।

নভেম্বরের এক ঝকঝকে বিকেল। আকাশে এক টুকরো মেঘ ছিল না। ক্যাম্পাসে দাঙ্গা পুলিশ এল। ৯ নম্বর বিল্ডিংয়ের ছেলেরা মিউজিক লাউঞ্জে বসে ইতালিয়ান কম্পোজিশন শুনছিল। অ্যান্টোনিও ভিভালদির 'এল চিমেন্তো দিলারমোনিয়া' ফুল ভলিউমে বাজছে, নিঃশব্দে দাঙ্গা পুলিশ পুরো বিল্ডিং ঘিরে ফেলল। কেউ টের পেল না। সে সময়ের চলমান ছাত্র ধর্মঘটের কথা তো আপনারা কমবেশি সবাই জানেন। সেটা ছিল ১৯৬৯ সালের একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ৯ নম্বর বিল্ডিংয়ে দাঙ্গা পুলিশের হানা দেওয়ার ঘটনাও দীর্ঘদিন ধরে পুরো ইউনিভার্সিটিতে সবার মুখে মুখে ফিরত। পত্রপত্রিকায় লেখালেখিও হয়েছিল বেশ। মোটামুটি কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছিল সেটা।

পুলিশ ৯ নম্বর বিল্ডিংয়ের সামনে কিছু বেঞ্চ জড়ো করে ব্যারিকেড দিয়ে দিল। আমি তখন সেখান দিয়ে যাচ্ছিলাম। পাশের কোনো একটা বিল্ডিং থেকে জি মাইনরে হেডেনের পিয়ানো সোনাটার সুর ভেসে আসছিল। পুলিশের ব্যারিকেডটা দেখেও আমি ঘটনার ভয়াবহতা আঁচ করতে পারিনি। আমার মনে হলো, শহরের অন্য মাথায় আমার গার্লফ্রেন্ডের বাড়িতে যাচ্ছি। আর যাওয়ার পথে আমাকে ক্যামেলিয়া ঝোপের একটা ঢালু পাহাড় পার হতে হচ্ছে। আসলে তখন ছিল স্বপ্ন দেখার বয়স। একটা রঙিন চশমা চোখে

ঝুলিয়ে রাখতাম সব সময়। সেই চশমা বাস্তবতার বুকে কল্পনার এক প্রলেপ বুলিয়ে দিত।

বাধাবিপত্তি পেরিয়ে যখন ৯ নম্বর বিল্ডিংয়ে ঢুকলাম, শনি গ্রহের ছেলেটা আমাকে তাদের বিল্ডিংয়ের সবচেয়ে ভালো চেয়ারটাতে নিয়ে বসাল। কেমিস্ট্রি ল্যাব থেকে চুরি করা একটা বিকারে (সিলিন্ডারের মতো দেখতে কাচের পাত্র) লুক-ওয়ার্ম বিয়ার খেতে দিল। পুলিশ যে আমাদের ঘিরে রেখেছে সেটা আর মনে রইল না। গল্প শুরু হয়ে গেল।

আমাদের ওখানে মাধ্যাকর্ষণ খুবই শক্তিশালী, সে বলল, 'g'-এর মান পৃথিবী থেকে অনেক বেশি। একবার কী হলো জানো? এক লোক চুইংগাম খাচ্ছিল। সে মুখ থেকে চুইংগাম মাটিতে ফেলল। তারপর সেই চুইংগামে তার জুতোয় আটকে গেল। চুইংগাম আর মাধ্যাকষর্ণ শক্তি মিলে তাকে যেন চেপে ধরল। সে কোনোভাবেই পা-টা টেনে তুলতে পারল না। বুঝতে পারছ, শনি গ্রহের মাধ্যাকর্ষণ কত মারাত্মক?

পারছি কিছুটা, আমি বললাম।

সে সময় মোটামুটি তিনশ কমেন্টের একটা স্টক আমার রেডি করা থাকত। লোকজন যখন গল্প বলত, তখন আমি তাদের কথার মাঝে মাঝে স্টক থেকে 'পারছি কিছুটা' টাইপ মন্তব্য করতাম। এতে করে তারা গল্পটাকে সামনে নিয়ে যেতে উৎসাহ বোধ করত।

সূর্যটা অনেক ছোট সেখানে, সে বলল, বাড়িতে একটা প্লেটের মধ্যে আপেল রেখে সেটাকে দূরের মাঠ থেকে দেখলে যতটা ছোট দেখায় ঠিক ততটা। সূর্য বেশ দূরে বলে সেখানে সব সময় বেশ অন্ধকার। আর ভয়ংকর ঠান্ডা।

আমি বললাম, তাহলে জায়গাটা ছেড়ে সবাই চলে যায় না কেন? অন্য কোনো গ্রহে গিয়ে থাকলেই তো পারে।

সেটা আমিও জানি না। সম্ভবত জন্মস্থান ছেড়ে কোথাও পালাতে মন সায় দেয় না। যেমন ধরো, আমি তোমাদের পৃথিবীতে পড়তে এসেছি ঠিকই। পড়াশোনা শেষ হয়ে গেলে আমি কিন্তু এখানে এক সেকেন্ডও থাকব না। আবার আমাদের শনিতেই ফিরে যাব। তোমাদের পৃথিবী থেকে যে জ্ঞানটা অর্জন করলাম, সেখানে গিয়ে সেগুলো কাজে লাগানোর চেষ্টা করব। সে জায়গাটাকে আরেকটু বসবাসযোগ্য করতে এই জ্ঞানটুকু বেশ কাজে দেবে।

মানুষ যখন আমাকে কোনো জায়গার গল্প বলে, সেখানকার রাস্তাঘাট,

মানুষজন, ঘরবাড়ি সবকিছু চোখের সামনে দেখতে পাই। সেগুলো জীবন্ত হয়ে ওঠে। তাদের কথা শুনতে পাই। তাদের জীবনের ছন্দ বুঝতে পারি।

মাঝেমধ্যে নাওকো তার গল্প বলত আমাকে। আমি এখনো তার প্রতিটা শব্দ মনে করতে পারি।

তার গল্পের শুরুটা হতো বেশ উদাস করা সুরে। স্টুডেন্ট লাউঞ্জের জানালার পাশে বসে গালের ওপর হাত রেখে ঘুম ঘুম কণ্ঠে সে একবার বলেছিল, আমি জানি না জায়গাটাকে ঠিক কী নামে ডাকা যেতে পারে।

বলে সে মৃদু হাসল। মেয়েরা যেমন মিষ্টি করে হাসে সে রকম। সেই হাসিতে আমি ডুবে যেতাম সব সময়। গল্পের বাকিটুকু শোনার জন্য আগ্রহ নিয়ে বসে থাকতাম। সে খুব ধীরে ধীরে কথা বলত। প্রতিটা শব্দ বলার আগে কয়েকবার ভেবে ঠিক শব্দটা বাছাই করে নিত।

আমরা একটা প্লাস্টিকের টেবিলে বসে ছিলাম। লাল রঙের টেবিল। আমাদের দুজনের মাঝখানে একটা কফির কাপ, কাগজের তৈরি। সিগারেটের আধখাওয়া টুকরোগুলো কাপ থেকে উপচে পড়ছিল। রুবেন্সের ছবির মতো লম্বা জানালার ভেতর দিয়ে আলো এসে পড়েছিল টেবিলে। টেবিলটা যেন দুটো ভাগ হয়ে গেল। আমার ডান হাত ছিল আলোর ভেতরে, বাঁ হাত অন্ধকারে।

১৯৬৯ সালের বসন্তের গল্প বলছি। দুজনের বয়স তখন বিশ বছর। লাউঞ্জের ভেতর ছেলেমেয়েরা নতুন বছরে নতুন জামা-জুতো পরে ঘোরাফেরা করছে। নিজেদের মধ্যে নতুন কোর্স আর বইয়ের তালিকা নিয়ে কথা বলছে। মাথায় নতুন সব চিন্তাভাবনা। আমি আর নাওকো যখন কথা বলছিলাম, চারপাশে তখন প্রচুর হট্টগোল।

নাওকো আবার তার গল্পটা শুরু করল, আসলে আমি বলতে চাচ্ছি যে তুমি ওটাকে সত্যিকারের কোনো শহর বলতে পারবে না। কারণ সেখানে আছে শুধু একটা রেলস্টেশন। রেললাইনের পাশে ছোট্ট হাস্যকর ধরনের একটা টু-বিট স্টেশন। সেটা এতই ছোট যে যখন ঝুমবৃষ্টি নামে, ওই রুটের নতুন ট্রেনচালক স্টেশনটা খেয়াল করার আগেই পার হয়ে যায়।

আমি মাথা নাড়লাম। তারপর আধা মিনিটের মতো চুপ করে রইলাম। দুজনে মিলে সূর্যের আলোতে সিগারেটের ধোঁয়া কীভাবে কুণ্ডলী পাকায়, সেটা দেখলাম।

সে বলল, অন্য সব স্টেশনের মতো সেই স্টেশনেও একটা কুকুর আছে। কুকুরটা সারাক্ষণ প্লাটফর্মের এক মাথা থেকে আরেক মাথায় হাঁটাহাঁটি করে। তুমি কি বুঝতে পেরেছ, স্টেশনটা কেমন?

আমি আবারও মাথা নাড়লাম।

স্টেশন থেকে বের হওয়ার পর, নাওকো বলল, তুমি একটা ছোটমতো গোলচত্বর দেখতে পাবে। তার পাশেই একটা বাসস্ট্যান্ড। কয়েকটা দোকান আছে। কিন্তু সেগুলোতে কোনো কাস্টমার নেই। খুবই নীরস ধরনের একটা জায়গা। একটু হেঁটে যদি সামনের দিকে যাও, একটা পার্কে পৌঁছাবে। সেখানে বাচ্চাদের খেলার জন্য একটা স্লাইড আর তিনটা দোলনা আছে।

স্লাইড করে পড়ে যাওয়ার পর বাচ্চারা যেন ব্যথা না পায়, সে জন্য কোনো বালুর বস্তা আছে ওখানে? জানতে চাইলাম আমি।

বালুর বস্তা?

সে কিছুক্ষণ ভাবল। একটু সময় নিয়ে স্মৃতি হাতড়াল। নিশ্চিত হয়ে নিতে চাচ্ছিল আসলেই বালুর বস্তা আছে কি না। তারপর বলল, হ্যাঁ, সেখানে একটা বালুর বস্তা আছে।

এরপর আমরা দুজনেই আবার নীরব হয়ে গেলাম। সিগারেটের আগুনটা নিভিয়ে দিয়ে কফির কাপে ফেলে দিলাম।

ও রকম আর কোনো শহর পৃথিবীতে আছে কি না আমি জানি না, নাওকো বলল, ও রকম একটা বোরিং শহর পৃথিবীতে কী কারণে তৈরি করা হয়েছে সে ব্যাপারেও আমার কোনো ধারণা নেই।

হয়তো ঈশ্বরের মনে হয়েছিল, এখানে একটা শহর থাকা দরকার। তাই তিনি মানুষের মাথার ভেতরে শহর তৈরির ব্যাপারটা ঢুকিয়েছেন, বললাম আমি।

নাওকো মাথা নেড়ে হাসল। এ রকম হাসি সে প্রায়ই হাসে। প্রতিটা সাবজেক্টে যারা নিয়মিত 'এ' গ্রেড পায়, তারা ও রকম কথায় কথায় হাসতে পারে। তবু কোনো এক অদ্ভুত কারণে সে চলে যাওয়ার পরও হাসিটা অনেকক্ষণ ধরে টেবিলে রয়ে গেল। 'এলিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড'-এর চেশিয়ার ক্যাটের হাসির মতো।

আমি হঠাৎ করে আবিষ্কার করলাম, প্লাটফর্মের এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত হেঁটে বেড়ানো সেই কুকুরটাকে আমার বেশ দেখতে ইচ্ছে করছে।

সেই ঘটনার ঠিক চার বছর পর ১৯৭৩ সালে আমি একা একা স্টেশনটা দেখতে গিয়েছিলাম। সেদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে আমি ভালো করে দাড়ি কামালাম। ইস্ত্রি করা শার্ট চাপিয়ে একটা নেকটাই বাঁধলাম গলায়। এর আগের ছয় মাস আমি কখনো গলায় বস্তুটা বাঁধিনি। বাঁধব যে সে কথাও কখনো মনে জাগেনি। তবু কেন যেন টাইটা বাঁধলাম। পায়ে দেওয়ার জন্য এক জোড়া নতুন কর্ডোভান শু বের করলাম। কুকুরটাকে একনজর দেখার জন্য আমার মন ছটফট করছিল।

ট্রেন থেকে স্টেশনে নামার সঙ্গে সঙ্গে তাজা ঘাসের গন্ধ পেলাম। বুক ভরে একবার শ্বাস নিয়ে সামনে তাকালাম। মনে একটা পিকনিক পিকনিক ভাব চলে এল। মে মাসের মিষ্টি বাতাস বইছে। এলোমেলো হয়ে গেল মনটা। চড়ুই পাখির কিচিরমিচির শুনতে পেলাম।

তারপর কোনো আগাম সংকেত না দিয়ে আমার খুব ঘুম পেয়ে গেল। বড় করে একটা হাই তুলে প্লাটফর্মের বেঞ্চিতে বসে পড়লাম। একটা সিগারেট ধরিয়ে আবার হাই তুললাম। যে ধরনের উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে সকালে বাসা থেকে বেরিয়েছি, তা একটু একটু করে কমে আসছিল। আসলে এই ব্যাপারটা আমার প্রায়ই ঘটে। এটাকে একধরনের অন্তহীন দেজা ভ্যু বলা যেতে পারে, যা বারবার ফিরে আসে।

একটা সময় ছিল যখন বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে বসে তাদের কোনো একজনের বাসার ফ্লোরে আমরা সবাই ঘুমিয়ে পড়তাম। সকালবেলা খেয়াল না করে কোনো বন্ধু হয়তো আমার মাথার ওপরে পা ফেলত।

'স্যরি, খেয়াল করিনি' কথাটা বলে সে সোজা বাথরুমে ঢুকে যেত। খুলে রাখা দরজার ভেতর থেকে পেশাবের শব্দ ভেসে আসত। এই ঘটনাটাও বারবার ঘটেছে আমার জীবনে। দেজা ভ্যু।

ঠোঁটের কোনায় সিগারেটটা ঝুলিয়ে গলার টাই একটু ঢিলা করে নিলাম। কোনো কারণ ছাড়াই পা দুটো বেশ ধরে এসেছিল। রক্ত চলাচল স্বাভাবিক রাখতে কংক্রিটের প্ল্যাটফর্মে জুতোর তলাটা বারবার সামনে-পেছনে করলাম। এমন না যে পায়ে কোনো ব্যথা হচ্ছে। তবু বেশ বিরক্ত বোধ করলাম।

স্টেশনের কোথাও কুকুরের কোনো চিহ্ন দেখতে পেলাম না।

. . .

কিছু একটা ঠিকঠাক চলছে না ...।

এই অনুভূতিটাও আমার ভেতরে প্রায়ই টের পাই। তখন ভেতরে ভেতরে খুবই অস্বস্তি বোধ করি। অনুভূতিটা একটু পরপর ফিরে আসে। আগেও এ রকম হয়েছে। তখন একটাই মাত্র সমাধান থাকে। তা হচ্ছে, গলা পর্যন্ত হুইস্কি টেনে পুরোপুরি মাতাল হয়ে ঘুমিয়ে যাওয়া। পরদিন সকালের অনুভূতিটা হয় আরও খারাপ। আগের দিনের অস্বস্তিকর অনুভূতির সঙ্গে একটা মাথাব্যথা যোগ হয়ে যায়। মাথাটা প্রচণ্ড ভার হয়ে থাকে।

বেশ আগে একবার এ রকম হলো। সারা রাত মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে ঘুমাচ্ছিলাম। সকালে চোখ মেলে দেখি, বিছানায় আমার দুপাশে দুটো মেয়ে। তারা যমজ। এর আগে বহুবার এ রকম ঘটনা ঘটেছে, ঘুম ভেঙে চোখ মেলে দেখেছি আমি একটা মেয়ের পাশে শুয়ে আছি। সেবারই প্রথম দুটো যমজ মেয়ের মাঝখানে নিজেকে স্যান্ডউইচের মতো আবিষ্কার করলাম। দুজন দুপাশ থেকে আমার কাঁধে নাক রেখে গভীর ঘুমে তলিয়ে আছে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি ঝলমলে একটা সকাল। রোববারের একটা মেঘহীন দিন।

একটু পরেই তারা দুজন প্রায় একই সঙ্গে ঘুম থেকে জেগে উঠল। শরীরে কোনো কাপড় ছিল না তাদের। টি-শার্ট এবং জিনস বিছানার পাশেই পড়ে ছিল। নিচু হয়ে সেগুলো তুলে শরীরে চাপিয়ে কিচেনে ঢুকে গেল তারা। আমার সঙ্গে একটা কথাও বলল না। তাদের ভাব দেখে মনে হচ্ছিল, আমার বাসায় তারা বহুদিন ধরে আছে। মুখস্থ তাদের চলাফেরা। প্রতিদিনের অভ্যাসের মতো করে কফি আর টোস্ট বানাল। ফ্রিজ থেকে মাখন বের করে নিয়ে এল। টেবিলটা সুন্দরভাবে সাজিয়ে ফেলল ব্রেকফাস্টের জন্য। জানালার বাইরে কিছু পাখি অবিরাম ডাকাডাকি করছে। তাদের কিচিরমিচির শব্দ মেশিনগানের গুলির মতো ধেয়ে আসছে। আমার মাথায় এত যন্ত্রণা হলো যে মনে হলো, মাথাটা দুভাগ হয়ে গেছে।

তোমাদের নাম কী? অবশেষে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

নামের মতো কিছু নেই আমাদের, ডান পাশে বসা মেয়েটা উত্তর দিল।

কথা সত্য। আমাদের নাম নেই, বাঁ পাশেরজন বলল।

আমরা তিনজন খাবার টেবিলে মুখোমুখি বসলাম। টোস্ট আর মাখন দিয়ে ব্রেকফাস্ট শেষ করে কফিতে চুমুক দিলাম এবং মুগ্ধ হয়ে ভাবলাম, কফিটা

সত্যিই চমৎকার হয়েছে।

তাদের মধ্যে একজন বলল, আমাদের নাম না থাকায় তোমার কি অসুবিধা হচ্ছে?

ঠিক বলতে পারব না, বললাম আমি।

তারা এটা নিয়ে কিছুক্ষণ ভাবল বলে মনে হলো।

সত্যিই যদি নাম দরকার হয়, তাদের মধ্যে একজন বলল, তুমি আমাদের জন্য দুটো নাম পছন্দ করছ না কেন?

আমাদের যেকোনো নামে তুমি ডাকতে পারো, অন্যজন তার সঙ্গে সুর মেলাল।

তারা দুজন যেভাবে কথা বলছিল, আমার মনে হলো আমি একটা স্টেরিও ব্রডকাস্ট শুনছি, প্রথমে একটা স্পিকার থেকে শব্দ বের হয়। সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা থেকে শব্দ হতে শুরু করে। সাউন্ড চেকের মতো ব্যাপারটা। ডান-বাম-ডান-বাম করে বাজে। আমার মাথাব্যথা বাড়তে শুরু করল।

কী রকম নাম দেব? জানতে চাইলাম আমি।

তোমার যেমন খুশি। ডান বা বাম, একজন বলল।

সঙ্গে সঙ্গে আরেকজন সুর মেলাল, ওপর বা নিচ।

সামনে বা পেছনে।

পূর্ব বা পশ্চিম।

ভেতর বা বাহির।

আমি তাদের কথায় বাধা দিয়ে মাঝখানে কিছু একটা বলতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু বলা হলো না। তারা দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে হাসিতে ফেটে পড়ল।

একটা কিছুর মধ্যে হুট করে ঢুকে পড়লে, সেটা থেকে বেরোনোর রাস্তা থাকে। জিনিসগুলো সেভাবেই তৈরি হয়। মেইল বক্স, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, চিড়িয়াখানা, লবণদানি—সব জিনিসই এই ফর্মুলায় তৈরি। তবে কিছু কিছু জিনিস আছে ব্যতিক্রম। যেমন ইঁদুর ধরার ফাঁদ। এর ভেতরে ইঁদুর ঢুকতে পারবে, কিন্তু বের হতে পারবে না।

আমি একবার বাসায় সিংকের নিচে একটা ইঁদুর ধরার ফাঁদ পেতেছিলাম। টোপ হিসেবে ব্যবহার করেছিলাম পেপারমিন্ট চুইংগাম। আসলে পেপারমিন্ট

গাম দিয়ে এর আগে কেউ ইঁদুর ধরেছে কি না আমার জানা ছিল না। এর থেকে ভালো কিছু দেওয়ার কথা ভেবেছিলাম। কিন্তু ক্লজেটের মধ্যে সেদিন কোনো খাবার ছিল না। চুইংগামটা ছিল আমার কোটের পকেটে। সঙ্গে একটা সিনেমার টিকিটের ছেঁড়া টুকরো।

তিন দিন পর এক সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি, একটা ছোট ইঁদুর ধরা পড়েছে। লন্ডনের ডিউটি ফ্রি শপগুলোতে যে রকম কাশ্মীরি সোয়েটার ঝোলানো থাকে, ইঁদুরটার গায়ের রং ছিল অনেকটা সে রকম। পনেরো-ষোলো বছর বয়সী একটা ছেলের চোখে-মুখে যে রকম একটা তরতাজা ভাব দেখা যায়, ইঁদুরটা সে রকম একটা চেহারা নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল।

ইঁদুরটা ধরা পড়ার পরে আমি বেশ চিন্তায় পড়ে গেলাম। সেটাকে নিয়ে আমার কী করা উচিত? পুরো একদিন ভেবে কোনো কূলকিনারা করতে পারলাম না। চতুর্থ দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখলাম, সেটা মরে গেছে। তার মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে আমি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা শিক্ষা পেলাম।

পৃথিবীর প্রতিটা জিনিসেরই একটা ঢোকার এবং বের হওয়ার দরজা থাকা উচিত। না হলে এ রকম দশা হবে।

স্টেশনের বেঞ্চে বসে এই কথাগুলোই ভাবছিলাম। রেললাইনের সমান্তরালে দূরে পাহাড়গুলো সারি বেঁধে আছে। মনে হচ্ছে, একটা রুলার দিয়ে টেনে সোজা করা। যেন একটা বড় বিড়াল ঘুমিয়ে আছে। একটু দূরে গভীর বন। একটা পুরোনো সবুজ কাগজের টুকরোর মতো মনে হচ্ছে বনটাকে। রেললাইনটা যেন সোজা গিয়ে সেই বনের মধ্যে কোনো এক জায়গায় হারিয়ে গেছে। দৃশ্যটা আমার মনকে বেশ বিষণ্ন করে তুলল।

সিগারেট শেষ করে আমি আকাশের দিকে তাকালাম। বহুদিন আকাশ দেখিনি। সত্যি কথা বলতে কি, অনেক দিন আমার চোখ দুটো কোনো নির্দিষ্ট জিনিসে স্থির হয়নি। আকাশে মেঘ ছিল না। বাতাসে একটু ধোঁয়ার ভাব আছে। বসন্তকালে এ রকম এক-আধটু কুয়াশা লেগেই থাকে।

পায়ের ব্যথা খুব বাড়ছিল। স্টেশনের বেঞ্চে বসে ব্যথাটা ভুলে থাকার জন্য নাওকোর কথা ভাবলাম।

• • •

এখন আমি আপনাদের একটা কুয়ার গল্প বলব। এ গল্পটাও নাওকোর কাছে শোনা। এখন যে স্টেশনে বসে আছি, কুয়াটা তার আশপাশেই কোথাও থাকার কথা। অন্তত সে আমাকে তা-ই বলেছিল।

নাওকোদের পরিবার যখন এ এলাকায় থাকতে আসে তখন তার বয়স বারো। ১৯৬১ সালের কথা। সে বছরই রিকি নেলসন 'হ্যালো মেরি লো' গানটা গেয়েছিল। জায়গাটা একদম নির্জন ছিল তখন। কোনো বাড়িতে একটা কুকুর পর্যন্ত ছিল না। লম্বা লম্বা ঘাসে ঢাকা ছিল মাঠগুলো। সবুজ সেই ঘাসভূমিতে দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো তেমন কিছুই নেই। অল্প কয়েকটা ফার্ম হাউস, আর কিছু শস্যখেত। একটা বড় ঝরনা। আর একটা নিঃসঙ্গ রেললাইন। নাওকো পুরো জায়গাটার এ রকম একটা বর্ণনা দিয়েছিল।

কোরিয়ান যুদ্ধের সময় নাওকোদের পরিবার এখানে শিফট করে। টোকিও থেকে এখানে এসে একটা দোতলা কাঠের বাড়িতে ওঠে ওরা। বাড়িটা মোটামুটি পশ্চিমা স্টাইলে তৈরি। পিলারগুলো ছিল অনেক বড় এবং মজবুত। বাইরের দিকটাতে সবুজ রং করা। আসলে ঠিক সবুজ না, সবুজের আলাদা আলাদা তিন রকমের শেড দেওয়া ছিল। একসময় রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে আর বাতাসে সেই আলাদা আলাদা তিনটা শেড মিলেমিশে চারপাশের ল্যান্ডস্কেপের মতো কেবলই সবুজ হয়ে যায়।

নাওকোরা সেখানে যাওয়ার আগে বাড়িটাতে একজন পেইন্টার থাকতেন। অয়েল পেইন্টার। বাড়িটা তারই ডিজাইন করা। সে বছর তীব্র শীত পড়েছিল। পুরো শীত প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়। বরফের মতো ঠান্ডা ছিল পানির ফোঁটা। মাঠজুড়ে পানি জমে গিয়েছিল। ভদ্রলোকের প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। বেশি বয়সে এই ধকল সয়নি। সেই বাড়ি এবং জীবনের মায়া কাটিয়ে তিনি অন্য জীবনের পথে পা বাড়ান। সেটা ছিল ১৯৬০ সালের কথা। ববি ভি সে বছর 'রবার বল' গানটা গেয়েছিল।

সে যা-ই হোক, আপনাদের একটা কুয়ার গল্প বলছিলাম। কুয়াটা যিনি খুঁড়েছিলেন, তার বাড়িটাও কাছাকাছি কোথাও হওয়ার কথা। নাওকো বলেছিল, এই স্টেশন থেকে হেঁটে যেতে ঠিক পাঁচ মিনিট লাগে। জলাভূমির কাছেই ছিল বাড়িটা। গরমের সময় সেখানে মশা আর ব্যাঙেদের রাজত্ব।

ভদ্রলোকের বয়স তখন ছিল পঞ্চাশ বছরের মতো। পাগলাটে ধরনের

লোক ছিলেন তিনি। মেজাজ সব সময় খিটখিটে থাকত। ওই এলাকায় তখন বিশুদ্ধ খাবার পানির সংকট। তাকে ভাড়া করে আনা হয়েছিল জায়গাটা সার্ভে করার জন্য। তিনি পুরো জায়গাটা বেশ কিছুদিন ধরে ভালো করে খুঁটেখুঁটে দেখলেন। মাঝেমধ্যে মুঠোভর্তি মাটি হাতে তুলে নিতেন আর নিজের মনেই বিড়বিড় করে কিছু একটা বলতেন। তারপর যখন তার মনে হলো তিনি সঠিক জায়গাটা খুঁজে পেয়েছেন, কিছু বন্ধুবান্ধব ডেকে নিয়ে এসে সবাই মিলে মাটি খুঁড়তে শুরু করলেন। একসময় নিচে পানি পেয়ে গেলেন তারা।

এভাবেই কুয়াটা খোঁড়া হয়, নাওকো বলেছিল, পানি ছিল বরফের মতো ঠান্ডা এবং স্বচ্ছ।

নাওকোর বয়স তখন সতেরো। সে বছর বসন্তে সেই ভদ্রলোক ট্রেন চাপা পড়ে মরে গেলেন। সেদিন খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। ভদ্রলোক কানে একটু কম শুনতেন। তিনি হয়তো ট্রেনের শব্দ শুনতে পাননি। ঘটনার পর মোট সাতজন পুলিশ এল। তারা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়া দেহের টুকরোগুলো এক করল। হাজার টুকরো হয়ে যাওয়া শরীরটাকে মোটামুটি পাঁচটা বালতিতে ভরে ফেলল। একদল ক্ষুধার্ত বন্য কুকুরের হাত থেকে মাংসগুলোকে কোনোরকমে উদ্ধার করল তারা। তবে আর এক বালতি মাংস সম্ভবত বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে পাশের পুকুরে হারিয়ে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সম্ভবত তা মাছেদের খাদ্যে পরিণত হয়।

তার দুই ছেলে ছিল। তারা কেউই বাবার মতো এই নির্জন জায়গায় ট্রেনে চাপা পড়ে মরতে চাইল না। অ্যাকসিডেন্টের পরপরই জায়গাটা ছেড়ে তারা শহরে চলে গেল। পরিত্যক্ত বাড়িটা কেউ কিনে নিল না। ধীরে ধীরে সেটা একসময় ভেঙে পড়ল। জায়গাটা লম্বা লম্বা ঘাসে ভরে গেল। যে কুয়াটা খোঁড়া হয়েছিল, গাছগাছালির ভেতরে সেটাও হারিয়ে গেল একসময়।

আমি কুয়া ভালোবাসি। যখনই কোনো কুয়া দেখি, নিচে ঢিল ছুড়ে মারি। পানি ছলাৎ করে ওঠে। সে শব্দ আমার বড় ভালো লাগে।

নাওকোর বাবা ১৯৬১ সালে এই জায়গায় এসে থাকতে শুরু করেন।

তিনি ছিলেন ফরাসি সাহিত্যের একজন পণ্ডিত। কলেজে পড়াতেন। নাওকো যখন স্কুলে যাওয়ার বয়সে পৌঁছাল, তিনি কোনো আগাম ঘোষণা ছাড়াই চাকরিটা ছেড়ে দিলেন। এবং বাড়িতে বসে পুরোনো ফরাসি পুঁথি থেকে তাদের হারিয়ে যাওয়া গল্পগুলো অনুবাদ করতে শুরু করলেন। তার মূল

আগ্রহ ছিল আধিভৌতিক গল্পগুলোতে। পতিত দেবদূত, ডাকিনী, শাকিনি আর প্রেতসাধকের গল্প নিয়েই সে সময় বেশি কাজ করেছেন।

ভদ্রলোক সম্পর্কে আমি বেশি কিছু জানি না। একবার তার একটা ছবি শুধু ম্যাগাজিনে দেখেছিলাম। ওইটুকুই। নাওকো বলেছিল, সে সময় তিনি বেশ বোহেমিয়ান দিন কাটিয়েছেন। ছবিতে তাকে দেখে আমার সে রকমই মনে হয়েছিল। মাথায় ক্যাপ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। চোখে গাঢ় সানগ্লাস। তার চোখ ক্যামেরার লেন্স থেকে ১ গজ ওপরে স্থির হয়ে আছে। সম্ভবত তিনি সেখানে কিছু একটা দেখছিলেন।

মরে যাওয়া সেই অয়েল পেইন্টার ছিলেন তার বন্ধুস্থানীয়। নাওকো যখন তার বাবার সঙ্গে এই জায়গায় এসে থাকতে শুরু করল, তখন পুরো জায়গাটা একটা নির্বাসন কলোনির মতো ছিল। তিনি এসে পরিবারসহ সেই কাঠের দোতলা বাড়িতে ওঠেন। তার মতো আরও কয়েকজন পাগলাটে চরিত্রের গবেষক সেই কলোনির মতো জায়গাটাতে ছিল। রুশ প্রজাতন্ত্রের সরকারের তরফ থেকে এ রকম একটা ক্যাম্প করা হয়েছিল একবার। তারা সাইবেরিয়াতে একটা পেনাল কলোনির মতো তৈরি করেছিল। সেখানে কিছু পাগলাটে চিন্তাভাবনার লোককে ধরে এনে তারা নির্বাসন দিয়েছিল। রাষ্ট্র সেই সব লোককে হুমকি হিসেবে দেখত। জাপান সরকারের তরফ থেকে সে রকম কিছু করা হয়নি। নাওকোর বাবা এসেছিলেন স্বেচ্ছানির্বাসনে।

লিওন ট্রটস্কির আত্মজীবনীতে এ রকম একটা নির্বাসন ক্যাম্পের কথা আমি পড়েছিলাম। খুব বেশি কিছু আমার মনে নেই। তবে এটুকু মনে আছে যে তিনি সেই ক্যাম্পের তেলাপোকা এবং বলগা হরিণের কথা লিখেছিলেন। সেই বলগা হরিণের একটা ভাস্কর্য আজও আছে মস্কোর রেড স্কয়ারে।

ট্রটস্কি সেই আত্মজীবনীতে তার ক্যাম্প থেকে পালানোর গল্প লিখে গেছেন। একটা স্লেজ গাড়ি চুরি করেছিলেন তিনি। স্লেজটাতে ঘোড়ার বদলে চারটা বলগা হরিণ জুড়ে দিয়ে তিনি রাতের অন্ধকারে সেই কলোনি থেকে পালিয়ে যান। হরিণগুলো স্লেজটাকে টেনে নিয়ে পাগলের মতো ছুটছিল। ঠান্ডা বাতাস কেটে সাঁই সাঁই করে উড়ছিল যেন। দুপাশে বরফের টুকরো ছড়িয়ে হরিণগুলো দৌড়াতে লাগল। পুরো দুটো দিন ছোটার পরে তারা একটা রেলস্টেশনের কাছে গিয়ে পৌঁছাল। হরিণগুলো ততক্ষণে ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। তারা মাটিতে শুয়ে পড়ল এবং গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল। সে ঘুম আর কখনো ভাঙেনি।

ট্রটস্কির চোখে তখন পানি চলে এল। তিনি মৃত হরিণগুলোকে ছুঁয়ে শপথ করে বললেন, 'আমি আমার দেশে সত্যিকারের ন্যায়বিচার ফিরিয়ে আনব। তার জন্য যা করতে হয়, তা-ই করব।'

রেড স্কয়ারে সেই চারটা বলগা হরিণের একটা ভাস্কর্য আজও আছে। চারটা হরিণ চারদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণে মুখ করা। স্তালিন চেয়েছিলেন ভাস্কর্যটা ধ্বংস করে দিতে। কিন্তু পারেননি। আপনি যদি কখনো মস্কো যান তো দেখবেন, প্রতি শনিবার সকালে জুনিয়র হাইস্কুলের ছোট ছোট ছেলেমেয়ে সেই বলগা হরিণের ভাস্কর্য ধুয়েমুছে পরিষ্কার করছে। তাদের গালের লালচে আভা এবং বিশুদ্ধ নিশ্বাস আপনার মনটাকে শান্ত করবে, বাঁচতে শেখাবে।

আগের গল্পে আবার ফিরে যাই।

নির্বাসন কলোনির কথা শুনলেই মনে হয়, পাহাড়ের ওপর বেশ নির্জন একটা জায়গা। কিন্তু নাওকোদের পরিবার যে কলোনিতে এসে উঠেছিল, সেটা স্টেশনের পাশে। সব বাসার সামনেই ছোটখাটো সাইজের একটা করে বাগান। কোনো কোনো বাড়িতে পুকুর পর্যন্ত ছিল।

কিন্তু জাপানে তখন পরিবর্তন আসছে। টোকিও অলিম্পিক ছিল সামনে। ফলে একধরনের নগরায়ণের পাঁয়তারা চলছে দেশজুড়ে। বুলডোজার দিয়ে গাছগুলোকে উপড়ে ফেলে মোটামুটি একঘেয়ে ধরনের সমতলভূমি বানিয়ে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল পুরো জায়গাটাকে। ধীরে ধীরে স্টেশনের পাশে তাদের সেই ছোট্ট কলোনিটা শহরের রূপ পেল।

নতুন ধরনের মানুষজন এসে থাকতে শুরু করল সেখানে। তাদের মধ্যে চাকরিজীবীই বেশি, বেতন খুব একটা বেশি না। প্রতিদিন ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠে পড়ত তারা। হাতমুখ ধুয়ে কমোটর ট্রেন ধরে অফিস চলে যেত। আর যখন ফিরে আসত, তখন রাত প্রায় অর্ধেক মৃত।

কেবল রোববার বিকেলগুলোতেই তারা এলাকাটা একটু ঘুরে দেখার সময় বের করতে পারত। অনেকটা যেন চুক্তি করেই তারা একসঙ্গে সবাই মিলে কুকুর পুষতে শুরু করল একদিন। কুকুরগুলো বছর ঘুরতে না ঘুরতেই প্রচুর পরিমাণে বাচ্চা পয়দা করে ফেলল। নাওকো আমাকে স্টেশনের যে কুকুরটার গল্প করেছিল, সেটা এই সব কুকুরের বাম্পার ফলনের আগের ঘটনা।

• • •

আমি পুরো একটা ঘণ্টা স্টেশনে বসে রইলাম। কুকুরটাকে দেখতে পেলাম না। সম্ভবত মরে গেছে। এর মধ্যে গোটা দশেক সিগারেট টেনে ফেলেছি। প্লাটফর্মের মাঝখানের একটা দোকান। একবার উঠে সেখান থেকে স্পিগোট খেলাম। বরফের মতো ঠান্ডা ড্রিংকটা। খেয়ে বেশ তৃপ্তি পেলাম। কিন্তু কুকুরটাকে দেখা গেল না।

তার বদলে অন্য আর একটা কুকুর দেখলাম। স্টেশনের পাশেই একটা বেশ বড় দিঘি। দেখে মনে হচ্ছিল একটা মরে যাওয়া নদী। মরে শুকিয়ে গিয়ে পুকুর হয়ে গেছে। বড় বড় ঘাস জমে ছিল পুকুরপাড়ে। কিছুক্ষণ পরপরই একটা-দুটো মাছ লাফিয়ে উঠছে। মাছ ধরার জন্য বেশ কিছু জেলে অপেক্ষা করছে। সম্ভবত তারা ঠিক করতে পারছে না যে ছিপ ফেলবে, নাকি পুকুরে নেমে জাল বা কোচ দিয়ে মাছ ধরার চেষ্টা করবে। জেলেদের সঙ্গে ছিল একটা বড় সাদা কুকুর।

আমি হাঁটতে হাঁটতে সেদিকে গেলাম। স্টেশনের সীমানায় গিয়ে দাঁড়ালাম। এবার সামনে এগোতে হলে বেড়াটা ডিঙোতে হবে। ঠিক তখনই আমি সাদা কুকুরটাকে দেখলাম। সে একসময় হাঁটতে হাঁটতে আমার ঠিক দশ মিটারের মধ্যে চলে এল। আমি তাকে কাছে ডাকলাম। সে তার বাদামি রঙের চোখ দুটো দিয়ে বেশ করুণার সঙ্গে আমার দিকে একবার তাকাল। দু-তিনবার লেজ নেড়ে তারপর অন্যদিকে হাঁটতে শুরু করল। আমি হাত ইশারায় আবার তাকে কাছে ডাকলাম। এবার সে হেলেদুলে আমার কাছে এল। বেড়ার বাইরে থেকে লম্বা জিহ্বাটা বের করে আঙুল চেটে দিল।

আমার পকেটে সব সময় চুইংগাম থাকে। একটা চুইংগাম বের করলাম। সেটার ওপরের কাগজের মোড়কটা খুলে কুকুরটাকে দেখালাম। সে এক মিনিট চুইংগামটার দিকে নীরবে তাকিয়ে রইল। তারপর সিদ্ধান্ত নিল যে এই জিনিসে তার চলবে না। যেদিক থেকে এসেছিল, সেদিকে চলে গেল আবার। আমি চুইংগামটাকে একটা বলের মতো করে গোল করলাম এবং জোরে ছুড়ে মারলাম কুকুরটার দিকে। একটু দূরে গিয়ে পড়ল সেটা। কুকুরটা এবার মত পরিবর্তন করে সোজা চুইংগাম বরাবর ছুটে গেল।

বেশ একটা তৃপ্তির ভাব নিয়ে বাড়িতে ফিরে এলাম।

ট্রেনে চেপে যখন ফিরে আসছিলাম নিজেকে বারবার বোঝালাম, পুরো ব্যাপারটার এখানেই শেষ। তুমি এবার নাওকোকে ভুলে যাও। তুমি এই ট্রিপে গিয়েছ, কারণ তুমি তাকে ভুলে যেতে চাও। স্টেশনটা দেখা শেষ। যে কুকুরটাকে দেখতে গিয়েছ সেটা দেখতে পাওনি। তার বদলে অন্য আরেকটা সাদা কুকুরের সঙ্গে তোমার বেশ খাতির হয়ে গেছে। এমনকি সে তোমার দেওয়া চুইংগাম পর্যন্ত নিয়েছে। যতটুকু সম্ভব করেছ তুমি। এবার নাওকোকে মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলো।

কিন্তু আমি ভুলতে পারি না। কোনোভাবেই ভুলতে পারি না, কী গভীরভাবে ভালোবাসতাম তাকে। কোনোভাবেই মেনে নিতে পারি না, সে মরে গেছে। একজন মানুষ মরে গেলেই সব শেষ হয়ে যায়? সেই বইয়ের পাতাটা বন্ধ হয়ে যায়?

যে ছেলেটার কাছে শুক্র গ্রহের গল্প শুনেছিলাম, সে আমাকে বলেছিল যে সেখানকার আকাশ মেঘে ঢাকা থাকে সব সময়। সূর্য অনেক কাছে হওয়ায় প্রচণ্ড তাপ সেখানে। প্রচণ্ড তাপে কম বয়সেই সব মানুষ মরে যায়। কেউ যদি মোটামুটি ত্রিশ বছর বেঁচে থাকে, তাহলেই সেখানে তাকে কিংবদন্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। বহুদূর থেকে লোকজন মানুষটাকে দেখতে আসে।

বেঁচে থাকার এই সংগ্রামটুকু করতে গিয়ে সেখানকার অধিবাসীরা একজন আরেকজনের খুব কাছে চলে আসে। তাদের অন্তর ভালোবাসায় পূর্ণ থাকে সব সময়। সেখানে কোনো হিংসা বা ঘৃণা নেই। সেখানে জীবন এত কঠিন যে হতাশা বা আত্মতৃপ্তি বোধ করার কোনো সুযোগ তাদের হয় না। তাদের মধ্যে ছোট-বড় কোনো ভেদাভেদ নেই। কেউ কাউকে অভিশাপ দেয় না। মারামারি করে না, খুন-খারাবির তো প্রশ্নই ওঠে না। সেখানে শুধু ভালোবাসা আছে।

সে আরও বলেছিল, আমাদের গ্রহে কেউ যখন মরে যায়, আমরা সেটা নিয়ে দুঃখ বোধ করি না।

কেন? আমি জানতে চেয়েছিলাম।

কারণ, সে যখন বেঁচে ছিল, আমরা তাকে আমাদের হৃদয়ের সবটুকু দিয়ে ভালোবেসেছি। তাই মরে গেলে দুঃখ বোধ করি না।

তার মানেটা এ রকম দাঁড়াচ্ছে যে কম বয়সে যদি কেউ মরে যেত, তাহলে

তোমরা ব্যাপারটাকে অপছন্দ করতে না।

হ্যাঁ। কেউ মরে যাওয়ার পর, তোমরা যে রকম করে বিলাপ করো, আমাদের ওখানে কেউ সে রকম করে না।

তোমরা কি আসলেই দুঃখ পেতে না? নাকি দুঃখ না পেয়ে থাকার ভান করতে?

কেউ মরে গেলে সত্যিই যদি দুঃখ পেতাম, তাহলে আমাদের গ্রহটা দুঃখের সাগরে কবে ডুবে যেত!

বাসায় ফিরে দেখলাম, যমজ দুই বোন কম্বলের নিচে জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে। তাদের দেখে মনে হচ্ছে, ক্যানের মধ্যে জোর করে ঢুকিয়ে রাখা দুটো সার্ডিন মাছ।

তাদের একজন বলল, ওয়েলকাম।

স্টেরিও সিস্টেমের দ্বিতীয় স্পিকারের মতো আরেকজন সঙ্গে সঙ্গে বলল, সারা দিন কোথায় ছিলে?

একটা স্টেশনে, আমি উত্তর দিলাম।

কোন স্টেশন?

সেখানে তুমি কেন গিয়েছিলে?

এখান থেকে অনেক দূরের একটা স্টেশন সেটা, আমি বললাম, একটা কুকুরকে দেখতে গিয়েছিলাম।

কী টাইপের কুকুর?

তুমি কুকুর পছন্দ করো?

একটা বড় সাদা কুকুর, আমি বললাম, না আমি কুকুর ঠিক পছন্দ করি না।

কথাটা বলে আমি টাইয়ের নটটা আলগা করে একটা সিগারেট ধরালাম। মেয়ে দুটো আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

তাদের একজন বলল, তোমার কি মনটা একটু খারাপ লাগছে কোনো কারণে?

আমি মাথা নাড়লাম।

তাহলে শুয়ে পড়ো, অন্যজন বলল।

আমি চুপচাপ গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম।

. . .

এই যে গল্পটা আমি বলছি এবং সামনে বলতে থাকব, সেটা মূলত আমাকে নিয়ে। কিন্তু এই গল্পে আরও একটা ছেলে আছে। তার নাম র‍্যাট। আসলে তার বাবা এই নামটা রাখেনি। তিনি হয়তো অন্য নাম রেখেছিলেন। কিন্তু সবাই তাকে র‍্যাট নামেই ডাকে। শরতের সেই বিকেলে, যখন আমি বিছানায় শুয়ে পড়লাম, তখন আমরা দুজন প্রায় চারশ মাইল দূরে দুটো জায়গায় ছিলাম।

আমার এই উপন্যাসটার শুরু ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। উপন্যাসে ঢোকার দরজা এটা। আশা করছি বের হওয়ার কোনো দরজাও নিশ্চয়ই আমি আপনাদের দেখাতে পারব। বের হওয়ার দরজা যদি আপনাদের দেখাতে না পারি, তাহলে এসব ছাইপাঁশ লিখে কোনো লাভ নেই। শুধু শুধু ইঁদুরের মতো এর মধ্যে ঢুকে মারা পড়ার কোনো মানে হয় না।

পিনবল মেশিনের জন্মকথা

কারও কোনো ধারণাই ছিল না রেমন্ড মলোনি লোকটা আসলে কে।

সবাই শুধু এটুকুই জানত যে এই নামে একজন লোক পৃথিবীর বুকে এসেছিল, বেশ কিছুদিন বেঁচে থাকার পর তিনি একদিন নিয়মমতো মরে যান। তার ব্যাপারে আমাদের জানাশোনা এখানেই শেষ। একটা গভীর কুয়ার নিচে নানা ধরনের জলপোকা থাকে। তাদের ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চাইলেও জানা হয়ে উঠবে না। তিনিও সেই জলপোকাদের মতো এক রহস্যময় মানুষ।

ইতিহাস মতে, ১৯৩৪ সালে এই দুর্নীতিগ্রস্ত পৃথিবীর বুকে পিনবল মেশিন নামে এক মারাত্মক জিনিসের আবির্ভাব ঘটে। সরাসরি আসমান থেকে প্রযুক্তির সোনালি মেঘে ভাসতে ভাসতে জিনিসটা পৃথিবীর মাটিতে অবতরণ করে। সে বছরই আটলান্টিক মহাসাগরের অপর পারে নাৎসি বাহিনীর উত্থান ঘটে এবং অ্যাডলফ হিটলার নামের এক ভয়ংকর লোক 'ভাইমার রিপাবলিক' পতনের সুদীর্ঘ সিঁড়িতে পা রাখেন। কাইজারের শাসনের দফারফা করে দেন।

রেমন্ড মলোনির জীবনকে ঘিরে তেমন কোনো গল্পকথা তৈরি হয়নি।

উড়োজাহাজ আবিষ্কার করা রাইট ব্রাদার্স কিংবা টেলিফোনের জনক আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেলের মতো তাকে ঘিরে কোনো কিংবদন্তি নেই। তার শৈশবের তেমন কোনো আকর্ষণীয় গল্প কিংবা নাটকীয় মুহূর্তের কথা কারও জানা নেই। জ্ঞানপিপাসায় যারা একদম মরে যাচ্ছে, তাদের জন্য বইয়ের একটা পাতায় তার নামটা শুধু এভাবে লেখা আছে যে ১৯৩৪ সালে রেমন্ড মলোনি প্রথম পিনবল মেশিন আবিষ্কার করেন। সেসব বইতে আপনি তার কোনো ছবি দেখতে পাবেন না। এ কথা বলার অপেক্ষাই রাখে না যে তার সম্মানে কোনো ভাস্কর্য নির্মাণ করা হয়নি।

আমি জানি, আপনারা কী ভাবছেন। আপনারা ভাবছেন, এ রকম নিরামিষ একজন লোককে নিয়ে এতগুলো কথা বলার মানেটা কী। আপনাদের জানিয়ে রাখি, রেমন্ড মলোনি নামে সেই ভদ্রলোক যদি পিনবল মেশিন আবিষ্কার না করতেন, তাহলে সেটার হয়তোবা জন্মই হতো না। অথবা জন্ম হলেও সেটা অন্য রকম কিছু একটা হতো।

পিনবল মেশিনের জন্ম এবং হিটলারের উত্থান—দুটোর মধ্যে একটা কমন বৈশিষ্ট্য ছিল। দুটোরই শুরুটা বেশ সন্দেহজনক। জিনিসগুলো সময়ের সঙ্গে টিকবে কি না তা নিয়ে মানুষের মনে ভাবনা ছিল, সন্দেহের বুদ্‌বুদ জেগে উঠত। কিন্তু খুব দ্রুতই সেই সন্দেহকে পাশ কাটিয়ে তারা ইতিহাসে জায়গা পাওয়ার একধরনের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে ফেলল। পুরো ব্যাপারটা একরকম জাদুকরি বিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেল। বিবর্তনের মূলে তিনটা ভিত্তি ছিল। সেগুলো হলো প্রযুক্তি, মূলধন এবং মানুষের আকাঙ্ক্ষা।

খুব দ্রুতই মানুষ মলোনির আবিষ্কার করা খেলনাটাকে আপন করে নিল এবং নিজেদের মতো করে এটার আরও কিছু বিবর্তন ঘটাল। তার ভেতর আরও অনেক নতুন নতুন ফিচার জুড়ে দিল। তারা বলল, 'এটার ভেতর একটু আলো দিলে কেমন হয় দেখি তো।'

তারপর একদিন তারা মেশিনটার সঙ্গে বিদ্যুতের সংযোগ দিল। এভাবে করেই ফ্লিপার বসানো হলো। সুতরাং, নতুন পিনবল মেশিনগুলোতে আলো জ্বলে উঠে ঝলমলে একটা ব্যাপার দাঁড়িয়ে গেল। ভেতরের বলগুলো একধরনের তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশে ঘুরতে শুরু করল। ফ্লিপারগুলো বলের ঘোরাঘুরি শেষে সেগুলোকে জোরে বাড়ি মেরে আবারও খেলায় ফিরিয়ে নিয়ে এল।

মানুষের মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য এটুকু যথেষ্ট ছিল না। স্কোরিং ব্যবস্থার

মধ্যেও সংস্কার এল। একজন প্লেয়ারের খেলার দক্ষতাকে ডেসিমালে প্রকাশ করার ব্যবস্থা হলো। 'টিল্ট লাইট' বলে একটা ফিচার জুড়ে দেওয়া হলো। কেউ যখন মেশিনটাকে ঘিরে অতি উৎসাহে ধাক্কাধাক্কি করত বা রাফ ট্যাকল করত, তখন টিল্ট লাইট জ্বলে উঠত এবং সেই প্লেয়ারকে কিছু জরিমানা করা হতো। সে সময় মেশিনটার জন্য 'সিকোয়েন্সিং' নামে একধরনের মেটাফোরিক্যাল কনসেপ্ট জন্ম নিয়েছিল। যে খেলোয়াড়ের সিকোয়েন্স মিলে যেত, তার বোনাস হিসাব করার জন্য বোনাস লাইট এবং এক্সট্রা বল ফিচার দুটো যোগ করা হলো। খুব স্বাভাবিকভাবেই পিনবল মেশিন প্রায় অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে গেল।

এই উপন্যাস পিনবলকে ঘিরে।

তবে পিনবল মেশিনটা সম্পর্কে যদি সত্যি কথা বলতে হয়, তাহলে এ রকম করে বলতে হবে :

পিনবল হলো এমন এক খেলার মেশিন যেখান থেকে কখনোই কিছু জেতা সম্ভব নয়। এটা খেলে কিছু সময় কাটানো যেতে পারে। কষ্ট করে কামানো টাকা অপচয়ের এক অনবদ্য মাধ্যম। মেশিনটা থেকে শুধু একটা জিনিসই অর্জন করা যায়। আর তা হচ্ছে, কোনো কিছুকে ডেসিমালে প্রকাশ করতে শেখা।

সে তুলনায় এটা খেলতে গিয়ে আপনি যা যা হারাতে পারেন, সেই তালিকাটা বেশ দীর্ঘ। যে পরিমাণ কয়েন আপনি এই মেশিনে হারবেন, তা দিয়ে মোটামুটিভাবে আমেরিকার সব প্রেসিডেন্টের একটা করে আবক্ষ মূর্তি দাঁড় করানো সম্ভব। (এই কথাটা বলার সময় ধরে নিচ্ছি, আপনি রিচার্ড নিক্সনের মূর্তিও দাঁড় করাতে চান)

যে সময়টুকু আপনার অপচয় হবে, তার কোনো হিসাব আপনি বের করতে পারবেন না। ধরেন, আপনি কোনো একটা মেশিনের সামনে দাঁড়িয়ে একা একা খুব মনোযোগ দিয়ে খেলাটা খেলছেন, আর তখন একজন লোক ফরাসি সাহিত্যিক মার্সেল প্রাউস্টের উপন্যাস পড়ছে। আবার আরেকজন তার গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে গাড়ি ড্রাইভ করে থিয়েটার দেখতে যাচ্ছে। কয়েক বছর পর দেখা যাবে, তাদের মধ্যে প্রথমজন হয়তো একটা মারাত্মক উপন্যাস লিখে ফেলবে আর দ্বিতীয়জন বিয়েশাদি করে খুবই শান্তিপূর্ণ একটা জীবন কাটাতে শুরু করে দেবে। অথচ আপনি বিরামহীনভাবে খেলাটা খেলেই যাবেন। আর

আমেরিকার প্রেসিডেন্টদের মূর্তি বানাবেন।

পিনবল জিনিসটাই এমন। এটা আপনাকে কোনো গন্তব্যে পৌঁছে দেবে না। এর কেবল একটাই গন্তব্য থাকতে পারে। আর তা হচ্ছে, আপনি হারবেন এবং হারার পর আপনার জেদ চাপবে। তখন আবার খেলবেন। প্রতিবার খেলা শেষে, রিপ্লে লাইটটা জ্বলে উঠবে আর আপনি নতুন করে খেলতে শুরু করবেন। খেলতে খেলতে একসময় একথাও আপনার মনে হতে পারে যে পিনবল খেলাটার উদ্দেশ্যই হচ্ছে শুধু খেলার জন্য খেলা।

আপনার কখনোই মনে হবে না, এটা খেলে আপনি সময়ের নিদারুণ অপচয় করছেন। কখনোই আপনার মধ্যে কোনো আত্মোপলব্ধি জাগবে না। তবে বিদ্রোহ জাগতে পারে। আপনার মধ্যে যে অহংকারটুকু আছে, হারতে হারতে সেটুকু নিভে যাওয়ার খানিকটা সম্ভাবনা আছে। একসময় এমনও মনে হতে পারে যে হারার জন্যই এই পৃথিবীতে আপনার জন্ম হয়েছে। এটা খেলতে গিয়ে আপনি কোনো কিছু বিশ্লেষণ করতে শিখবেন না। বরং ভাগ্যের হাতে নিজেকে সমর্পণ করতে শিখে যাবেন।

আপনি যদি আত্মোপলব্ধি জাগাতে চান বা পিনবল মেশিন থেকে জীবনের জন্য পজিটিভ কোনো কিছু খুঁজতে চান, তাহলে মেশিনের 'টিল্ট লাইট' জ্বলে উঠবে এবং আপনাকে জরিমানা করা হবে।

আমরা এখন খেলাটা খেলতে শুরু করব। চলুন, খেলা যাক।

১

যমজ দুই বোনকে আলাদা করার কোনো একটা উপায় নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি আমি সেটা খুঁজে পাইনি। তাদের চেহারা থেকে শুরু করে কণ্ঠস্বর, চুল সব এক রকম। শরীরে এমন কোনো তিল অথবা জন্মদাগ নেই যা দিয়ে তাদের আলাদা করা যেতে পারে। একজন আরেকজনের হুবহু ফটোকপি। আমি একটা পর্যায়ে গিয়ে পুরোপুরি হাল ছেড়ে দিলাম। ধরে নিলাম, তাদের আলাদা করা সম্ভব নয়। যেকোনো বিষয়ে তারা মোটামুটি একই ধরনের রিঅ্যাকশন দেয়। একই ধরনের খাবার পছন্দ করে।

একসঙ্গে একই গান গায়। দুজন একসঙ্গে ঘুমাতে যায় এবং একই সঙ্গে ঘুম থেকে জেগে ওঠে। তাদের পিরিয়ডের সময়ও একই।

পুরো ব্যাপারটাই আমার কল্পনার বাইরে। যতটুকু ভাববার ক্ষমতা আমার আছে, যমজ বোনের ব্যাপারটা তার থেকে অনেক দূরের একটা বিষয়। তবে আমি এটুকু বুঝতে পারি যে আমার যদি এ রকম একটা ফটোকপি টাইপের যমজ ভাই থাকত, আমি সম্ভবত পাগল হয়ে যেতাম।

যমজ বোনদের দেখে অবশ্য মনে হতো না যে তারা পাগল হয়ে গেছে। বরং বেশ সুখে-শান্তিতে আমার বাসায় বাস করছিল। একটা পর্যায়ে গিয়ে তারা বুঝতে পারল, আমি তাদের আলাদা করতে পারছি না। তারা বেশ অবাক হয়ে গেল। একটু রেগে গেছে বলেও মনে হলো আমার।

তাদের একজন বলল, আমরা পুরোপুরি আলাদা।

অন্যজন বলল, মোটেই এক রকম না।

আমি কিছু না বুঝেই মাথা নাড়লাম। মাথা নেড়ে আসলে কী বোঝাতে চাইলাম আমি নিজেও জানতাম না।

তারা দুজন আমার বাসায় এসে ওঠার পর ঠিক কত দিন পার হয়েছে, সেটাও আমি ভেবে বের করতে পারি না। মাঝে মাঝে মনে হয় এক মাস। তারপরই ভাবি এক বছর। এভাবে সময়টা বাড়তে বাড়তে একসময় অনন্তকালে গিয়ে ঠেকে। তারা এখানে আসার পর আমার ভেতরের ঘড়িটা কী করে যেন বন্ধ হয়ে গেছে। দিন-তারিখের কোনো হিসাব নেই। যেসব ক্ষুদ্র জীব কোষ বিভাজন করে তাদের বংশ বৃদ্ধি করে, তারাও বোধ হয় আমার মতো এ রকম সময়হীন জগতে বেঁচে থাকে।

আমার এক বন্ধু আছে। যে বন্ধুটার কথা আপনাদের আগেই বলেছি, তার নাম র‍্যাট। এখন যার গল্প বলব সে অন্য আরেকজন। সে আর আমি মিলে ঠিক করলাম একটা অফিস দেব। টুকটাক অনুবাদের কাজ জানতাম। ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় ফ্রিল্যান্স কিছু কাজ করেছি। অফিস-টফিস দিয়ে সেই কাজটাই একটু বড় আকারে শুরু করব।

শিবুয়া থেকে নামপেইডাই যেতে পাহাড়ের যে ঢাল, তার পাশের রাস্তায় একটা ভদ্রগোছের অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিলাম আমরা। আসলে অ্যাপার্টমেন্ট না বলে কনডোমিনিয়াম বলাই ভালো। সেই কনডোতে অফিস শুরু হলো।

ব্যবসাটা শুরু করার জন্য টাকা দরকার ছিল। আমার বন্ধুর বাবা টাকাটা দিলেন। অবশ্য সেটা খুব বড় অঙ্কের টাকা ছিল না। আবার খুব কমও বলা যায় না।

টাকা হাতে পেয়ে প্রথমেই আমরা বেসিক কাজগুলো সেরে নিলাম। অফিসের সিকিউরিটি ডেপোজিটের টাকা জমা দিলাম। একটা টেলিফোনের সংযোগ দরকার ছিল। ধরাধরি করে সেটার ব্যবস্থাও হয়ে গেল। এরপর তিনটা স্টিলের ডেস্ক কিনলাম। একটা মেটাল সাইনবোর্ড বানালাম, আমাদের কোম্পানির নামটা সেখানে জ্বলজ্বল করে লেখা। তার পরও কিছু টাকা রয়ে গেল। দশটা ডিকশনারি আর ছয় বোতল আমেরিকান বারবন হুইস্কি কেনা হলো সে টাকা দিয়ে। অবশেষে পত্রিকায় অফিসের বিজ্ঞাপন দিয়ে আমরা বারবনের বোতল খুলে বসলাম। নতুন কেনা ডেস্কে বসে হুইস্কি খেতে খেতে আমরা সম্ভাব্য ক্লায়েন্টের জন্য অপেক্ষা করতাম। আমি ১৯৭২ সালের বসন্তকালের গল্প করছি।

বেশি দিন অপেক্ষা করতে হয়নি আমাদের। ক্লায়েন্টরা নানা ধরনের অনুবাদের কাজ নিয়ে আসতে শুরু করল। ভালোভাবে কাজ শেষ করাটাই তখন চ্যালেঞ্জ। কয়েক মাসের মধ্যেই আমাদের ব্যবসাটা দাঁড়িয়ে গেল। বিভিন্ন জায়গা থেকে অনুবাদের কাজ পেতে শুরু করলাম। সেই প্রফিট দিয়ে আমরা একদিন একটা এয়ার কন্ডিশনার কিনে ফেললাম। এভাবেই একসময় রেফ্রিজারেটর আর হোম-বার সেটও কেনা হলো। হুইস্কির বোতল দিয়ে সেই বার সাজানো হলো। বারবনের গ্লাসে চুমুক দিয়ে এক সন্ধ্যায় আমার বন্ধু বলল, আমরা পেরেছি।

আমার ভেতরে আশ্চর্য রকমের উষ্ণ একটা অনুভূতি হলো বন্ধুর কথাটা শুনে। মনে হলো, আমার সারা জীবনে এ রকম মধুর কোনো কথা শুনিনি।

কিছু কিছু অনুবাদের কাজ শেষ করে সেগুলোকে বই আকারে ছাপানোর দরকার হতো। আমার বন্ধু এক ছাপাখানার সঙ্গে চুক্তি করে ফেলল। সেই ছাপাখানা থেকেও কাজের কিছু কমিশন পেতাম আমরা। যেভাবে কাজের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছিল, তাতে আমাদের আরও কিছু লোকজন দরকার হয়ে পড়ছিল। আমি যে ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম সেখানকার স্টুডেন্ট অফিসে যোগাযোগ করে তাদের বললাম, তারা যেন আমাদের কিছু ভালো ছেলেমেয়ে জোগাড় করে দেয় যারা বিদেশি ভাষা জানে এবং অনুবাদের কাজ করতে পারে।

একজন অফিস সেক্রেটারি রাখাও জরুরি হয়ে পড়ল। আমরা এক কমবয়সী

মেয়েকে চাকরিতে নিলাম, যার মূল কাজ ছিল, যে বইগুলো অনুবাদের জন্য আনা হবে সেগুলোর দেখভাল করা, নিয়ম করে বইয়ের ধুলো ঝাড়া। এ ছাড়া টুকটাক চিঠিপত্র লেখা এবং ছোটখাটো কিছু কাজ যেগুলো হুট করে হাজির হতো, সেগুলো করে দিত সে।

মেয়েটা ছিল চটপটে টাইপের। সবে বিজনেস স্কুল থেকে পাস করেছে। তাকে যে কাজই দেওয়া হতো, সে বিপুল উৎসাহ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত। খুব দ্রুত শেষ করে ফেলত। তার একটাই মাত্র বাজে দিক ছিল। তা হচ্ছে, সে যখন একা থাকত তখন গুনগুন করে 'পেনি লেন' গানটা গাইবার চেষ্টা করত। গানটা গাওয়ার সময় কোরাস অংশটুকু ফেলে দিত। দিনে কমপক্ষে বিশবার গাইত গানটা।

আমার বন্ধু বলেছিল, মেয়েটা খুব কাজের। তাকে পেয়ে আমাদের ভাগ্যে মোটামুটি একটা জ্যাকপট লেগে গেছে।

কথাটা আসলেই সত্যি। সে যেন চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে চলে না যায়, সে জন্য আমরা তাকে খুশি রাখার একটা ব্যবস্থা নিলাম। জয়েনিংয়ের সময় যে বেতন ধরা হয়েছিল তার প্রায় পঞ্চাশ ভাগ বাড়িয়ে দিলাম। এবং তাকে এককালীন বোনাস হিসাবে একটা বড় অঙ্কের টাকা দেওয়া হলো। টাকার অঙ্কটা বেশ অবিশ্বাস্য রকমের। তার মূল বেতন হিসাব করলে মোটামুটি পাঁচ মাসের বেতনের সমান দাঁড়াবে সেটা। সাপ্তাহিক এবং সরকারি ছুটির বাইরেও বছরে দুবার তাকে দশ দিন করে মোট বিশ দিনের ছুটি অফার করা হলো। এরপর তার চাকরি ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়ার কোনো আশঙ্কা রইল না।

আমাদের কনডোতে দুটো বড় বড় রুম। আর ছিল একটা কিচেন কাম ডাইনিং। বেশ খোলামেলা জায়গা, আলো-হাওয়া খেলা করে। পুরো অ্যাপার্টমেন্টে একটাই বাজে দিক। সেটা হলো, কিচেন কাম ডাইনিংটা ছিল দুটো রুমের ঠিক মাঝখানে। বাড়িওয়ালা বাড়ি তৈরির সময় এই অদ্ভুত ডিজাইন কীভাবে জোগাড় করেছিল সেটাও এক রহস্য।

আমরা রুমগুলো ভাগাভাগি করে নিলাম। আমি একদম ভেতরের রুমটা পছন্দ করলাম। আমার বন্ধু বাইরের দিককার রুমে বসতে শুরু করল। মেয়েটার জন্য বরাদ্দ হলো মাঝখানের কিচেন কাম ডাইনিং। সেখানে বসেই সে তার যাবতীয় কাজ সারতে লাগল। তার জন্য বরাদ্দ করা কাজের বাইরেও অতিরিক্ত কিছু কাজ সে হাতে নিল। যেমন কিচেনের তেলাপোকা মারা এবং

আমাদের জন্য বারবন হুইস্কির পেগ বানানো। এই কাজগুলো করার সময় সে গুনগুন করে 'পেনি লেন' গানটা গাইত।

অফিসের টাকা থেকে কিছু টাকা নিয়ে আমি একদিন দুটো ক্যাবিনেট কিনে আনলাম। আমার ডেস্কের দুপাশে ক্যাবিনেটগুলো সেট করলাম। বাঁ পাশের ক্যাবিনেটে যে কাজগুলোর অনুবাদ শেষ হয়নি সেগুলো থাকত। ডান পাশের ক্যাবিনেটে থাকত শেষ হয়ে ডেলিভারির অপেক্ষায় থাকা প্রজেক্ট।

নানান ধরনের অনুবাদের কাজ করতে হতো আমাদের। আমেরিকা থেকে আসা অনেক ধরনের ইংরেজি বই এবং আর্টিকেল আসত অনুবাদের জন্য। সেগুলোর মধ্যে উইলিয়াম স্টাইরনের খটমট নিবন্ধ যেমন ছিল, তেমনি ছিল সেফটি রেজরের ম্যানুয়াল। কাজগুলো হাতে পাওয়ার পর সেগুলোর ওপর কত তারিখের মধ্যে শেষ করতে হবে সেই ডেডলাইন ট্যাগ বসিয়ে দিয়ে বাঁ দিকের ক্যাবিনেটে রেখে দিতাম। যখন শেষ হয়ে যেত, ডান দিকের ক্যাবিনেটে পাচার করতাম। প্রতিটা কাজ শেষে নিয়ম করে দুই আঙুল পরিমাণ হুইস্কি টানতাম।

অনুবাদের জন্য আসা কাজগুলোর সবচেয়ে আনন্দের দিক হচ্ছে, সেগুলো নিয়ে আমাদের খুব বেশি মাথা খাটাতে হতো না। খুবই সহজ টাইপের কাজ। মোটামুটি আক্ষরিক অনুবাদ করে দিলেই ক্লায়েন্ট খুশিতে বগল বাজাত। পুরো বিষয়টা ছিল বাঁ হাতের তালুতে একটা কয়েন ধরে মুহূর্তেই সেটাকে ডান হাতের তালুতে পাচার করার মতোই সহজ। আমার বাঁ দিকের ক্যাবিনেট থেকে কোনো ফাইল কিছু বুঝে ওঠার আগেই ডান দিকের ক্যাবিনেটে পাচার করে দিতাম।

আমরা তিনজন প্রতিদিন সকাল দশটায় অফিসে আসতাম। বিকেল চারটায় বেরিয়ে যেতাম। অফিসের বাইরেও বেশ একধরনের পারিবারিক আবহ আমাদের মধ্যে ছিল। প্রতি শনিবার বিকেলে আমরা তিনজন মিলে কাছাকাছি কোনো ডিসকোতে যেতাম। সেদিন বারবন হুইস্কির বদলে জে-অ্যান্ড-বি খেতাম। এবং খুব নাচানাচি করতাম।

টাকাপয়সা ভালোই আসত। সেটার ভাগ-বাঁটোয়ারার প্রক্রিয়াটাও বেশ মজার ছিল। আমরা প্রথমেই বাড়ি ভাড়ার টাকাটা আলাদা করতাম। অফিস খরচের জন্য একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা ধরে রাখা ছিল। এ ছাড়া আমাদের সেক্রেটারিকে বেতন দিতে হতো। যেসব ছেলেমেয়ে ফ্রিল্যান্স অনুবাদের কাজ করছিল, তাদেরও প্রজেক্ট বেসিসে টাকা দেওয়া হতো। সবকিছুর পরে ট্যাক্সের

টাকা বাদ দিয়ে যে টাকা থাকত, সেটাকে আমরা মোট দশ ভাগে ভাগ করতাম।

এক ভাগ আমাদের অফিসের বিজনেস সেভিংস অ্যাকাউন্টে জমা থাকত। সেই টাকা দিয়ে পরে বিজনেস ডেভেলপমেন্টের পরিকল্পনা ছিল আমাদের। পাঁচ ভাগ টাকা যেত আমার বন্ধুর কাছে। অবশিষ্ট চার ভাগ আমি পেতাম। ভাগাভাগি করার সময়, আমরা সব টাকা একসঙ্গে জড়ো করে টেবিলে রাখতাম। তারপর হেডস আপ পোকার খেলার মতো করে টেবিলের দুপাশে দাঁড়াতাম। আপনারা *চিনচিন্নাটি কিড* ছবিটা দেখেছেন কি না জানি না। পোকার খেলতে ভালোবাসে এ রকম সব লোকই ছবিটা দেখে থাকবে। সেখানে টেবিলের দুদিকে দাঁড়িয়ে স্টিভ ম্যাককুইন আর অ্যাডওয়ার্ড রবিনসন পোকার খেলে। তাদের মাঝখানেও এ রকম ক্যাশ টাকা রাখা থাকত।

আমার বন্ধু যে আমার থেকে টাকার ভাগটা একটু বেশি পেত, এটা নিয়ে আমার মনে কোনো দুঃখ ছিল না। আমার কাছেও ভাগাভাগির এই ব্যাপারটা যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছিল। হ্যাঁ, খাটাখাটনি করে কাজটা আমি শেষ করতাম ঠিকই। কিন্তু সেগুলো জোগাড় করে আনত সে। পুরো ব্যবসার ঝক্কি-ঝামেলা তাকেই পোহাতে হতো। ম্যানেজমেন্টের দিকটা সেই দেখত। বিজনেস ডেভেলপমেন্টের ব্যাপারগুলোও তাকেই সামলাতে হতো। তার ওপর ব্যবসার মূলধনও তার বাবার।

আমার বন্ধুর টাকার প্রয়োজনও ছিল আমার থেকে বেশি। প্রচুর খরচ করতে হতো তাকে। তার ব্যক্তিগত জীবনটা বেশ ভালো রকমের ঝামেলায় পূর্ণ। তার বউ বছরের অধিকাংশ সময় অসুস্থ থাকে। তিন বছরের একটা বাচ্চা আছে তাদের। অফিস শেষে বাসায় ফিরে আমার বন্ধুকেই বাচ্চাটাকে সামলাতে হয়। একটা ভক্সওয়াগন গাড়ি ছিল তার, সেটায় শত শত সমস্যা। প্রায় প্রতিদিনই সেটাকে নিয়ে গ্যারেজে দৌড়াতে হতো। এত কিছুর পরও সে অফিসের কাজ নিখুঁতভাবে সামলাতে পারে।

অবশ্য মাঝেমধ্যে ভাগের টাকা বাড়ানোর চেষ্টা যে করিনি, এমন নয়। আমারও যে টাকা দরকার সেটা বোঝাতে চেয়েছিলাম। কী কী খরচ সেটা বোঝাতে গিয়ে একদিন আমার বন্ধুকে বলেছিলাম, আমার বাসায় দুটো যমজ মেয়ে থাকে। তাদের সব খরচ আমাকেই দিতে হয়।

এই যমজ বোনের গল্প মানুষকে খাওয়ানো খুব কঠিন। খুব স্বাভাবিকভাবেই সে আমার কথার একটা বর্ণও বিশ্বাস করেনি। সুতরাং আমাদের শেয়ার সমান

হলো না। সে পাঁচ ভাগ পেয়ে যেতে লাগল আর আমি আমার চার ভাগ নিয়ে সন্তুষ্ট রইলাম।

এভাবেই আমার জীবন কেটে যাচ্ছিল। বিকেলের নরম রোদের মতোই একধরনের শান্তি ছিল আমার জীবনে।

তিনরঙা ব্রোশিয়ারে আমাদের কোম্পানির স্লোগান লেখা ছিল অনেকটা এভাবে, 'মানুষ যা কিছু হাতে লিখতে পারে, আমরা তার সবই অনুবাদ করতে পারি।' ছয় মাস পর পর আমাদের ব্যবসায় কিছুটা মন্দাভাব দেখা যেত। তখন আমরা তিনজন মিলে শিবুয়া স্টেশনের আশপাশের রাস্তাগুলোতে ব্রোশিয়ারগুলো বিলিয়ে আসতাম।

জীবন এভাবে করে ঠিক কত দিন চলতে পারে?

হাঁটতে হাঁটতে প্রায়ই এই প্রশ্নটা মনের মধ্যে নীরবে এসে জমা হতো। প্রতিদিন অফিস থেকে বাড়িতে ফিরে আমার একটাই কাজ ছিল। তা হলো, অনন্ত সময় ধরে জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের লেখা *ক্রিটিক অব পিওর রিজন* বইটা পড়া। মাঝে মাঝে যমজ বোনদের বানানো কফি খেতাম। সেটা নিঃসন্দেহে পৃথিবীর সেরা কফি।

মাঝেমধ্যে সময়ের দিক দিশা হারিয়ে ফেলতাম। মনে হতো, একধরনের অনন্ত সময়ে বাস করছি আমি। মাত্র গতকাল ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনাকে মনে হতো এক বছর আগে ঘটেছে। আবার কখনো এক বছর আগের ঘটনাকে গতকালকের বলে ভুল হয়। অবস্থা যখন খুব বেশি খারাপ হতো, তখন এমনও হয়েছে যে এক বছর পরে যেটা ঘটবে, মনে হতো গতকালই মাত্র সেটা ঘটে গেছে।

মাসের পর মাস, বছরের পর বছর আমি একটা গভীর সুইমিংপুলের নিচে একা ডুবে রইলাম। আরামদায়ক উষ্ণ পানি, নরম আলো আর নীরবতা আমাকে ঘিরে রইল। চুপচাপ নিজের মধ্যে হারিয়ে গেলাম।

যমজ বোনদের আলাদা করার একটা উপায় অবশ্য একদিন পাওয়া গেল। তারা বাড়িতে নেভি ব্লু কালারের সোয়েট শার্ট পরত। সেখানে দুটো সংখ্যা লেখা ছিল। ২০৮ আর ২০৯। ডান পাশের নিপলের ওপরে '২' লেখা থাকত। আর বাম নিপলের ওপরে '৮' অথবা '৯'। দুই স্তনের ভাঁজে '০' চাপা পড়ে যেত।

প্রথম যেদিন আমি ব্যাপারটা আবিষ্কার করি তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম,

এই সংখ্যাগুলোর মানে কী?

তারা বলেছিল, কোনো মানে নেই।

কিন্তু আমার তো মনে হচ্ছে কোনো একটা কিছুর সিরিয়াল লেখা আছে।

কীসের সিরিয়াল?

কোম্পানিতে যে রকম সিরিয়াল নম্বর দেওয়া হয় সে রকম। কোনো একটা জিনিস তৈরির সময়, সেটা কত নাম্বারের জিনিস কোম্পানি মাঝেমধ্যে ছাপ মেরে দেয়।

সে রকম কিছু না, ২০৮ বলল।

আমাদের একজন লোক এগুলো দিয়েছে, ২০৯ বলল।

কে দিয়েছে? জানতে চাইলাম আমি।

সুপার মার্কেট থেকে পেয়েছি। সেদিন তাদের দোকানটা উদ্বোধন করা হচ্ছিল। কাস্টমারদের তারা নানা ধরনের জিনিসপত্র গিফট দিচ্ছিল। এই টি-শার্ট দুটো আমরা ফ্রি পেয়েছিলাম।

আমি ছিলাম তাদের ২০৯ নম্বর কাস্টমার।

আর আমি ছিলাম ২০৮ নম্বর।

তাদের দুজনের দিকে আঙুল তুলে বললাম, ওকে তাহলে বিষয়টা এ রকম দাঁড়াচ্ছে যে আমি এখন থেকে তোমাকে ২০৮ বলে ডাকব আর তোমাকে ডাকব ২০৯।

কিন্তু এভাবে করে তো তুমি আমাদের চিনতে পারবে না, ২০৮ বলল।

কেন?

তারা দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে হাসল। ম্যাজিকের মতো সোয়েট শার্ট দুটো বদলে নিল। তারপর ২০৯ আমার দিকে তাকিয়ে বলল, এখন আমি ২০৮।

আর আমি ২০৯, অন্যজন সুর মেলাল।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

তার পরও যতবারই আমার মনে হয়েছে, দুজনকে আলাদা করা প্রয়োজন, তখনই আমি তাদের শার্টের নাম্বারের সাহায্য নিয়েছি। অন্য কোনো উপায় আমার জানা ছিল না।

তাদের দুজনের ওই সোয়েট শার্ট দুটো ছাড়া অন্য কোনো জামাকাপড় ছিল না। মাঝে মাঝে মনে হতো, তারা হয়তো কোনো এক বিকেলে রাস্তায় হাঁটতে বেরিয়েছিল। হাঁটতে হাঁটতে রাস্তায় আমার অ্যাপার্টমেন্টটা চোখে পড়ে। তখন

কোনো কারণ ছাড়াই ভেতরে ঢুকে যায় এবং সেখানে থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। বাড়ি ফিরে গিয়ে কাপড়চোপড় আনার সময় বা ইচ্ছা কোনোটাই তাদের ছিল না।

সপ্তাহের শুরুতেই আমি তাদের হাতে কিছু টাকা দিতাম যেন যা কিছু প্রয়োজন তারা সেটা কিনে নিতে পারে। সেই টাকা দিয়ে তারা শুধু বাসার জন্য কিছু খাবারদাবার, টয়লেট টিস্যু, টয়লেট ক্লিনার এসব কিনে আনত। কোনো জামাকাপড় কেনেনি নিজেদের জন্য। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের বাইরে একবার শৌখিন যে জিনিসটা তারা কিনেছিল, সেটা হচ্ছে এক প্যাকেট ক্রিম বিস্কুট। কফি ফ্লেভারের।

একটামাত্র কাপড়ে তোমাদের সমস্যা হয় না? আমি জানতে চেয়েছিলাম।

একেবারেই না, ২০৮ জবাব দিয়েছিল।

কাপড়চোপড় নিয়ে আমরা খুব বেশি ভাবি না, ২০৯ সঙ্গে সুর মেলাল।

সপ্তাহে একবার তারা সোয়েট শার্টগুলো সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলে। তখন তারা কিছু গায়ে দেয় না। ওই অবস্থায় ঘরের মধ্যে ঘোরাফেরা করে। সেই সময় তারা বাইরে যায় না। বাসার জন্য কিছু কেনাকাটার প্রয়োজন হলে আমিই বাইরে যাই। বাইরে কোনো কাজ না থাকলে বিছানায় শুয়ে শুয়ে *ক্রিটিক অব পিওর রিজন* পড়ি। আর আড়চোখে দুবোনকে দেখি। আমার তখন মনে হয়, আমি সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জগতে এসে পড়েছি। আমাদের চেনা-পরিচিত পৃথিবীতে এ ধরনের ব্যাপারগুলো সহজে ঘটে না।

মাঝেমধ্যে কাজ শেষ করে বাড়িতে ফিরে দেখতাম ২০৮ ও ২০৯ লেখা দুটো সোয়েট শার্ট দক্ষিণমুখী বারান্দায় ঝুলছে। কোনো কারণ ছাড়াই তখন আমার চোখে পানি চলে আসত।

তাদের আমি অনেক প্রশ্নই করতে পারতাম। তোমরা কেন আমার বাসায় এসেছ, কত দিন থাকবে? সবচেয়ে বড় কথা, তোমরা কারা, তোমাদের বয়স কত, কোথায় জন্মেছ?

কিন্তু প্রশ্নগুলো আমি কখনো করিনি। তারাও নিজ থেকে কিছু বলেনি।

প্রতিদিন সকালে তারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কফি বানাত আর আমরা তিনজনে মিলে সেই কফি খেতাম। সন্ধ্যায় গলফ ক্লাবের ভেতর হারানো বল খুঁজতাম। রাতে অর্থহীন শরীরের খেলায় মেতে উঠতাম। দিনের সবচেয়ে মজার অংশ ছিল, যখন আমি তাদের খবরের কাগজ পড়ে শোনাতাম।

পৃথিবী সম্পর্কে তারা খুব কমই জানত। বার্মা ও অস্ট্রেলিয়া যে সম্পূর্ণ পৃথক দুটো দেশ, এই তথ্যটা পর্যন্ত তাদের জানা ছিল না। মোটামুটি তিন দিন লেগে গেল তাদের বোঝাতে যে ভিয়েতনাম এখন দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। এবং তারা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করছে। প্রেসিডেন্ট নিক্সন কেন ভিয়েতনামের রাজধানী হ্যানয়ে বোমা ফেলছে, সেটা বোঝাতে কেটে গেল পরের চার দিন।

তুমি কাদের সাপোর্ট করো? ২০৮ জানতে চাইল।

কাদের মানে? বললাম আমি।

নর্থ ভিয়েতনাম নাকি সাউথ? ২০৯ বলল।

আমি ঠিক জানি না। এটা আসলেই খুবই কঠিন প্রশ্ন।

এটা কেন কঠিন প্রশ্ন?

কারণ আমি ভিয়েতনামে থাকি না।

আমার জবাবে তারা মোটেই সন্তুষ্ট হলো না। আসলে আমি নিজেই সন্তুষ্ট হতে পারছিলাম না।

২০৮ বলল, তারা ঠিক কী কারণে যুদ্ধ করছে? তাদের চিন্তাভাবনা আলাদা রকমের, এ জন্য?

সেটা বলতে পারব না, বললাম আমি, কিন্তু সেই হিসেবে পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষেরই চিন্তাভাবনা আলাদা।

সে ক্ষেত্রে তো পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষেরই নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করার কথা, ২০৯ বলল, তারা কেউই কখনো কারও বন্ধু হতে পারবে না।

তা-ও ঠিক, বললাম আমি, বন্ধু হওয়া আসলেই খুব কঠিন একটা কাজ।

পৃথিবীর যে এই দশা হবে তা দস্তোয়েভস্কি বহু আগে ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন। আর আমি সেগুলো বুকে টেনে নিয়েছিলাম। পুরো সত্তরের দশক আমি এভাবেই বেঁচে ছিলাম।

২

১৯৭৩ সাল।

সেবার শরতের শুরুতেই বাতাসে একটা অশুভ সংকেত ভেসে এল। র‍্যাট অনুমান করল, সামনে খুব খারাপ কিছু একটা হতে চলেছে। এসব ব্যাপার সে আগে থেকেই কী করে যেন বুঝে ফেলে। জুতোর মধ্যে পেরেক বের হয়ে গেলে যেমন একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি হয়, র‍্যাটের মধ্যেও সে রকম একধরনের অনুভূতি কাজ করে।

সেপ্টেম্বরের শুরুতেই সেবার গ্রীষ্ম চলে গেল। শরতের বাতাস বইতে শুরু করল। র‍্যাটের মধ্যে কোনো পরিবর্তন এল না। সে তখনো তার পুরোনো সামার টি-শার্ট, জিনস আর চপ্পল পায়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। এলাকার বড় ভাই জে-র বারে বসে সে আগের মতোই ঠান্ডা বিয়ার টেনে গেল। পাঁচ বছর আগে সে সিগারেট পুরোপুরি ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু সেবার সে নতুন করে আবার সিগারেট ধরল। সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে পনেরো মিনিট পরপর ঘড়ি দেখাটা তার একধরনের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল।

তখন তাকে দেখে মনে হতো, তার সময় এত দিন থেমে ছিল। তারপর হুট করে তীব্র গতিতে বয়ে যেতে শুরু করেছে এবং সেই গতির সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে তাকে বারবার ঘড়ি দেখতে হচ্ছে। র‍্যাট কোনোভাবেই বুঝে উঠতে পারল না কেন তার এ রকম হচ্ছে।

সে অন্ধের মতো একটা দড়ি ধরে ক্রমাগত সামনে এগোল। পাহাড়, নদী, মাঠ, বন পার হলো। কোথাও কোনো দরজা দেখলে সে দরজাটা ধাক্কা দিয়ে খোলার চেষ্টা করল। কিন্তু সেই দড়ি ধরা পথ বেয়ে কোনো গন্তব্যে গিয়ে পৌঁছাল না। একটা নদী যেভাবে সমুদ্রের সামনে গিয়ে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করে, নিজেকে ঠিক সে রকম নিয়তির দাস বলে মনে হলো তার।

এক দরজা দিয়ে গ্রীষ্ম চলে গেল। অন্য দরজা দিয়ে শরৎ এল। যে দরজা দিয়ে গ্রীষ্ম বিদায় নিয়েছিল, র‍্যাট দৌড়ে গিয়ে সে দরজার সামনে দাঁড়াল। বলল, একটু দাঁড়াও। তোমাকে বলার মতো আমার আরও কিছু কথা আছে।

কিন্তু তার কথা শোনার জন্য গ্রীষ্ম দাঁড়িয়ে রইল না। চলে গেল। অন্য দরজা দিয়ে শরৎ ঘরে ঢুকে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল। সিগারেট ধরাল

আরাম করে। এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে শরৎ র‍্যাটকে বলল, তুমি গ্রীষ্মকে যে কথাটা বলতে চাচ্ছ, সেটা আমাকে বলতে পারো। আমি শুনব। সে আমার বন্ধুর মতো। পথে-ঘাটে কখনো দেখা হয়ে যাবে তার সঙ্গে। আমি তাকে তোমার কথাটা জানিয়ে দেব।

র‍্যাট বলল, তার আর দরকার হবে না।

তোমার যেমন ইচ্ছে। তবে চাইলে বলতে পারতে, আমি কথাটা পৌঁছে দিতে পারতাম। এটা কোনো ব্যাপারই না, শরৎ বলল।

তার শেষ কথাটা রুমের মধ্যে ভাসল বেশ কিছুক্ষণ। আসলেই এটা কোনো ব্যাপার না। শুধু একটা সিজন চলে গেছে। গ্রীষ্ম গেছে, শরৎ এসেছে। এটা আসলেই বড় কিছু নয়।

সে সময় র‍্যাট প্রতিদিন সন্ধ্যায় জে-র বারে আড্ডা দিত।

জে-র জন্ম জাপানে নয়। সে চায়না থেকে এসেছে। আমি এবং র‍্যাট অনেক বছর ধরেই তার বারে বসে একসঙ্গে আড্ডা দিই। আমাদের সেই ছোট্ট বন্দর শহরে আড্ডা দেওয়ার অন্য কোনো জায়গা ছিল না। একসময় আমি পড়াশোনার জন্য টোকিও চলে আসি। আর তখন র‍্যাট পড়াশোনা পুরোপুরি ছেড়ে দেয়। জে-র বারে বসে একা একা বিয়ার টানাটাই তখন তার মূল কাজ হয়ে দাঁড়ায়। তার বাবার টাকার কোনো অভাব ছিল না। সুতরাং, পড়াশোনা না করলেও তার বেশ চলে যেত।

জে-র বারে ঢুকে সোজা কাউন্টারে গিয়ে বসত সে। জে তখন কাউন্টারের পেছন থেকে র‍্যাটের পাশে এসে কাস্টমার সিটে বসে পড়ত। ঠান্ডা কোক আর বিয়ার খেত দুজনে। সঙ্গে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই। দূর থেকে দেখে তাদের পুরোনো বিবাহিত দম্পতি বলে মনে হতো।

প্রতিবছরই এমন হয়। শরৎকাল এলেই র‍্যাটের মন খারাপ হয়। এই সিজনটা কিছু মন খারাপ করা ব্যাপার নিয়ে র‍্যাটের পৃথিবীতে আসে। গ্রীষ্মের ছুটিতে আমি টোকিও থেকে আমার সেই হোমটাউনে বেড়াতে যেতাম। পুরো ছুটি মজা করতাম র‍্যাটের সঙ্গে মিলে। সে সময় আমরা দুজনে মিলে এক সুইমিংপুল পরিমাণ বিয়ার টানতাম। আমার ছুটি শেষ হয়ে যেত সেপ্টেম্বরের শুরুতেই। তখন আমাকে টোকিও ফিরতে হতো। র‍্যাটের যাওয়ার কোনো জায়গা ছিল না। বন্ধু হারিয়ে সে একা একা জে-র বারে বসে থাকত। আরও

বিষণ্ন হয়ে পড়ত সে। তার জীবনের উত্তাপ একটু একটু করে কমে যেত। বালু যেভাবে পানির কণা শুষে নেয় শরৎ এসে সেভাবে তার জীবনের আনন্দটুকু নিঃশেষ করে দিত।

এই সময়টা জে-র জন্যও খুব খারাপ। ব্যবসাপাতির বারোটা বেজে যায়। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি এসে তার বারের কাস্টমার অনেক কমে যায়। শুধু র‍্যাট আসে নিয়মিত। তারা দুজন কাউন্টারে বসে ভাবে প্রতিবছর এমন কেন হয়। অবশ্য ভেবে কোনো কূলকিনারা করতে পারে না। রাতে বার ক্লোজ করার সময় জে দেখে, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই ভাজার জন্য যে পরিমাণ আলু কেটেছিল বিকেলবেলা, তার অর্ধেকটা রয়ে গেছে।

র‍্যাট তখন তাকে সান্ত্বনা দেয়, চিন্তা কোরো না। কিছুদিনের মধ্যেই আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। তখন ফ্রেঞ্চ ফ্রাই ভেজেও শেষ করতে পারবে না।

র‍্যাটের কথায় জে কোনো ভরসা পায় না। মিনমিন করে বলে, সে রকম হলে তো ভালোই।

কথাটা বলে সে আবার কাউন্টারের পেছনে গিয়ে বসে। কোনো কারণ ছাড়াই একটা পরিষ্কার কাপড় দিয়ে শেলফে রাখা বোতল থেকে কাল্পনিক ধুলো ঝাড়তে শুরু করে।

তিন বছর আগে র‍্যাট প্রথম আবিষ্কার করে যে তার সময় থেমে গেছে। সে বছরই সে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছিল।

তার ইউনিভার্সিটি ছেড়ে দেওয়ার পেছনে নিশ্চয়ই অনেকগুলো কারণ ছিল। কারণগুলো, ছোট ছোট তারের মতো একটা আরেকটার সঙ্গে পেঁচিয়ে ছিল। অনেকটা ডেটোনেটরের মতো। তারপর একদিন সেখানে কেউ একজন ম্যাচের কাঠি জ্বালিয়ে দেয় এবং বুম ...। বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণের পর কিছু কিছু কারণের মৃত্যু ঘটে, কিছু কিছু কারণ একেবারে উড়ে যায়, আর কিছু বহাল তবিয়তে বেঁচে থাকে।

ভার্সিটি ছাড়ার কারণটা র‍্যাট কখনো ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেনি। সত্যিকারের একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে ঘণ্টা পাঁচেক সময় হয়তো লাগত। সে সময়টুকু তার ছিল না। তা ছাড়া সে মনে মনে এ রকম একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে গিয়েছিল যে কারণ খুঁজে কোনো লাভ নেই। এতে ঝামেলা বাড়বে। খুঁজে পেলে কারণগুলো মানুষকে বলতে হবে। সেটা আরেকটা বিরক্তিকর ব্যাপার।

একজনকে বললে সে হয়তো আরেকজনকে বলবে। এভাবে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়বে কথাটা। তখন পরিচিত, অপরিচিত, অর্ধপরিচিত সব ধরনের মানুষ যার যার নিজস্ব দাবি নিয়ে র‍্যাটের সামনে এসে দাঁড়াবে। কারণগুলো শুনতে চাইবে। সবকিছু বাদ দিয়ে তখন তাকে জনে জনে গল্প বলে বেড়াতে হবে। খুবই বিরক্তিকর একটা ব্যাপার হবে সেটা। সেই চেষ্টা করা আর খাল কেটে কুমির আনা মোটামুটি কাছাকাছি ব্যাপার। গল্প বলার পুরো প্রক্রিয়াটা ভাবতে গেলেই র‍্যাটের পেটব্যথা শুরু হয়। মাথার বদলে পেটে কেন ব্যথা হয় সে জানে না।

অবশ্য যারা তাকে এ ব্যাপারে জোরাজুরি করত, তাদের জন্য র‍্যাট মোটামুটি মুখস্থ একটা উত্তর রেডি করে রেখেছিল। সে নির্বিকারভাবে বলত, ভার্সিটির মাঠে ঘাসগুলো যেভাবে কাটা হয়, সেটা আমার পছন্দ না।

এ কথা শুনে এক মেয়ে সত্যি সত্যি সেই ঘাস কেমন করে কাটা হয় এবং কী কারণে র‍্যাটের সেটা পছন্দ হয়নি, সেটা দেখতে গেল। দেখে এসে র‍্যাটকে বলল, আমি তো কোনো সমস্যা টের পেলাম না। ঘাস তো ঠিকভাবেই কাটা আছে। যদিও ঘাসের মধ্যে বেশ কিছু ময়লা-আবর্জনা, কাগজের টুকরো জমে ছিল। তার পরও শুধু এ কারণে তুমি পড়াশোনা ছেড়ে দেবে?

দেখো, র‍্যাট উত্তর দিয়েছিল, ঘাস কাটার ব্যাপারটা তোমার পছন্দ হয়েছে বলে আমারও পছন্দ হতে হবে, বিষয়টা তেমন নয়। পুরোটাই যার যার রুচির ব্যাপার।

স্বাভাবিকভাবেই কথা আর সামনে এগোয়নি। এগুলো তিন বছর আগের কথা। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সবকিছু বদলে যায়। অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে বদলায়।

র‍্যাট যে বছর ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছিল, সেই বছর বাবা-মার সঙ্গে থাকা বন্ধ করে দেয়। পাহাড়ের ওপর বিশাল তিনতলা বাড়িটা ছেড়ে দিয়ে আলাদা একটা অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে ওঠে। সেই অ্যাপার্টমেন্টও অবশ্য তার বাবার নামে। শহরের আনাচকানাচে, নামে-বেনামে ভদ্রলোকের অসংখ্য প্রপার্টি ছিল। র‍্যাটের আলাদা থাকা নিয়ে তার কোনো আপত্তি ছিল না। বরং একটু যেন খুশিই হয়েছিলেন।

র‍্যাটের বাবা-মা কোনো না কোনো দিন ওই অ্যাপার্টমেন্টটা তাদের ছেলের নামে লিখে দিতেন। সে রকমই একটা পরিকল্পনা তাদের ছিল। তারা ভাবলেন, আগেভাগে গিয়ে র‍্যাট যদি সেখানে উঠতে চায়, তাহলে খারাপ হবে

না। একা একা থেকে জীবনের কঠিন বাস্তবতা একটু হলেও বুঝতে পারবে।

কিন্তু বাস্তবটা ছিল কঠিন। বেশ কঠিন। র‍্যাটের নিজে নিজে বোঝার জন্য প্রায় দুর্বোধ্য। র‍্যাট জীবনের কোনো বাস্তবতা টের পেল না। আগের মতোই গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়াল। একটা তরমুজকে আপনি যতই চেষ্টা করেন না কেন সে কখনোই সবজি হয়ে উঠতে পারবে না। ব্যাপারটা অনেকটা সে রকম।

অ্যাপার্টমেন্টটা খুব সুন্দর করে সাজানো। তিনটা বড় বড় রুম সেখানে। সতেরো ইঞ্চি কালার টিভি, ফ্রিজ, এসি, টেলিফোন, ঝকঝকে বাথরুম সবই ছিল। তার মার্সিডিজ ট্রায়াম্প গাড়ি রাখার জন্য গ্যারেজটা বেশ বড়। অ্যাপার্টমেন্টের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ব্যাপার হলো একটা সুন্দর ব্যালকনি। সেখানে বসে রোদ পোহানো যায়। সাগর দেখা যায় দক্ষিণমুখী জানালা দিয়ে তাকালে। সারা দিন পাখি কিচিরমিচির করে।

অলস বিকেলগুলো র‍্যাট জীবনকে বোঝার মতো বাজে কাজে ব্যয় না করে ব্যালকনিতে বেতের চেয়ারে বসে কাটিয়ে দিত। সে যখন চোখ বন্ধ করত তখন কুলকুল করে বয়ে যাওয়া নদীর স্রোতের শব্দ শুনতে পেত। তার শরীরের ভেতর দিয়ে বহমান নদীর মতো বয়ে যেত সময়ের স্রোত। এবং এভাবেই সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিয়ে দিতে লাগল।

সে সময়েই তার মধ্যে 'সময় থেমে গেছে' অনুভূতিটা জাগতে শুরু করে।

৩

পেপারওয়ালা ছাড়া আর কেউ কখনো আমার দরজায় নক করে না। আমার সঙ্গে যে কারও প্রয়োজন থাকতে পারে, সে রকম গুরুত্বপূর্ণ মানুষ আমি সে পর্যন্ত হয়ে উঠতে পারিনি। সুতরাং কেউ যদি নক করেই ফেলে, আমি ধরে নিই যে লোকটা পেপারওয়ালা। তাই দরজা খোলার কোনো চেষ্টা আমি করি না। তার বদলে চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকাই আমার কাছে বুদ্ধিমানের কাজ মনে হয়।

কিন্তু সেদিন আর শুয়ে থাকতে পারলাম না। লোকটা যে-ই হোক, মোটামুটি পঁয়ত্রিশ বারের মতো নক করে ফেলেছে দরজায়। এই অবস্থায় শুয়ে থাকা

যায় না। কোনোমতে ঘুম ঘুম চোখে যমজ দুই বোনের নগ্ন শরীরের ফাঁক গলে বিছানা থেকে শরীরটাকে টেনে তুললাম। গায়ে রোব চাপিয়ে দরজা খুললাম।

দেখি চল্লিশের কাছাকাছি বয়সের এক লোক দাঁড়িয়ে আছে। পরনে ধূসর রঙের একটা ইউনিফর্ম। মাথার হেলমেটটা এমনভাবে এক হাতে চেপে ধরে আছে যেন তার খুব আদরের কুকুরছানা। অন্য হাতে একটা টুলবক্স আর একটা ব্যাগ। ব্যাগের মধ্যে মাঝারি সাইজের একটা প্যাকেট বাইরে থেকে বোঝা যাচ্ছে। রোববার সকালে এই লোকের আমার সঙ্গে কী কাজ থাকতে পারে বুঝে পেলাম না।

টেলিফোন কোম্পানি থেকে এসেছি, লোকটা বলল, আপনাদের সুইচ প্যানেলটা চেঞ্জ করতে হবে।

দরজায় হেলান দিয়ে মাথা নাড়লাম। ভালো করে আর একবার তাকালাম লোকটার দিক। মুখজুড়ে ঘন খোঁচা খোঁচা দাড়ি। সে দাড়ি গালের সীমানা পার হয়ে চোখের পাতায় গিয়ে ঠেকেছে। বিকেল পাঁচটার দিকে পৃথিবীর বুকে যে রকম কালচে ছায়া পড়ে, সে রকম ছায়া তার চোখে-মুখে। আমি খুবই বিরক্ত বোধ করলাম। ভোর চারটা পর্যন্ত দুই যমজ বোনের সঙ্গে ব্যাকগ্যামন গেম খেলেছি। আমার খুব ঘুম পাচ্ছিল। রোববারের সকালগুলো ঘুমিয়ে কাটাতে হয়। এটাই পৃথিবীর নিয়ম। টেলিফোন কোম্পানির লোকের সঙ্গে সেদিন সকালে কোনো কাজ থাকার কথা নয়।

কাজটা কি বিকেলের দিকে করা যায় না? ঘুমোচ্ছিলাম এখন, বললাম আমি।

না, এটা এখনই করতে হবে, সে বেশ রূঢ়ভাবে জবাব দিল।

কেন?

লোকটার প্যান্টে বোধ হয় হাজারখানেক পকেট। খুঁজে পেতে সেখান থেকে একটা কালো রঙের নোটবুক বের করল সে। সেটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, দেখুন এখানে। আজ সারা দিনে কোন কোন এলাকায় কাজ করতে হবে সব লেখা আছে। দেখতে পাচ্ছেন? আপনার এখানে কাজ শেষ করার পর আমাকে অন্য পাড়ায় যেতে হবে। এটা বিকেল পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখার কোনো সুযোগ নেই।

যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম, সেখানে দাঁড়িয়েই আমি নোটবুকে চোখ বোলালাম। সেখানে আসলেই শহরের অন্য প্রান্তের একটা জায়গার নাম লেখা। তার পরও একটু গাঁইগুঁই করে বললাম, আপনাকে আসলে কী করতে

হবে? সুইচ প্যানেল চেঞ্জ করা মানেটা কী?

খুবই সহজ একটা কাজ, সে বলল, বেশি সময় লাগবে না। আমি পুরোনো সুইচ প্যানেলটা খুলব। সেটার বদলে নতুন একটা লাগিয়ে দেব। এটুকুই। কাজটা করতে দশ মিনিটের বেশি লাগবে না।

কিন্তু এখন যেটা আছে, সেটাতে আমি খুশি। আমার নতুন চাই না।

বললাম তো, ওটা পুরোনো মডেলের সুইচ।

আমিও তো বললাম, পুরোনো জিনিসে আমার কোনো অসুবিধা নেই।

সে দুবার মাথা নেড়ে আমার দিকে তাকাল। তারপর ঠান্ডা স্বরে বলল, দেখুন এটা আসলে শুধু আপনার একার ব্যাপার না। পুরো মহল্লার ব্যাপার। পুরো মহল্লার সুইচ প্যানেল আপনার বাসায় বসানো। সুতরাং, এই প্যানেলটা যদি পুরোনো হয়, সেটা পুরো মহল্লাতেই অ্যাফেক্ট ফেলবে। লাইনগুলো একটা আরেকটার সঙ্গে কানেক্টেড।

সেটা কীভাবে?

সবগুলো বাসার ফোন সংযোগ আপনার বাসার সুইচ প্যানেলে এসে যোগ হয়েছে। সেটাই এই এলাকার 'হাব'। এই 'হাব' আবার আমাদের হেডকোয়ার্টারের সেন্ট্রাল কম্পিউটারের সঙ্গে যুক্ত। সবার বাসা থেকে ওই কম্পিউটারে গিয়ে সিগন্যাল পৌঁছাবে। পুরোনো সুইচ প্যানেলগুলো নতুন ধরনের কম্পিউটারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে না। সেই সিগন্যাল পৌঁছানোর জন্য নতুন ধরনের সুইচ প্যানেল বসানো দরকার। না হলে কম্পিউটার সিগন্যাল পাবে না।

বুঝতে পেরেছি। আপনি সম্ভবত হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যারের ম্যাচ আপ করাতে চাচ্ছেন।

সেটা যদি বুঝতেই পারেন, তাহলে দরজাটা ছাড়েন। আমি ভেতরে গিয়ে দশ মিনিটের মধ্যে কাজটা শেষ করি।

এরপর আমার আর কিছু করার ছিল না। দরজা থেকে সরে দাঁড়ালাম। তবু একটা শেষ চেষ্টা হিসেবে বললাম, কিন্তু আমি যত দূর জানি এ রকম একটা জিনিস গুরুত্বপূর্ণ কোনো জায়গায় বসানোর কথা। পুরো মহল্লার টেলিফোন কানেকশনের সুইচ প্যানেল আমার অ্যাপার্টমেন্টে থাকার কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছি না।

এখানেই আছে, সে বলল, আমি ইনফরমেশন না নিয়ে আসিনি।

কিন্তু এত ছোট একটা বাসা! এখানে তো এটা থাকার কথা নয়। থাকলে নিশ্চয়ই আমার চোখে পড়ত। সাধারণত বড় বড় সুপার মার্কেটে বা বড় অ্যাপার্টমেন্টে এসব জিনিস বসানো থাকে।

অনেকে নিজেদের বাড়িতে এটা রাখতে চায় না। কারণ এতে অনেক জায়গা লাগে। এই বাড়ির মালিক সম্ভবত অনুমতি দিয়েছিলেন সুইচ প্যানেল বসানোর।

লোকটা ভেতরে ঢুকল। প্রথমেই কিচেনে তন্নতন্ন করে খুঁজল। কিন্তু কিছু পেল না। কিচেনে চেয়ারের ওপরে মোজা পায়ে দাঁড়িয়ে সিলিংয়ে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল। সেখানেও কিছু নেই।

পুরো ব্যাপারটাই গুপ্তধন খোঁজার মতো, সে বলল, মানুষজন সুইচ প্যানেলগুলোকে উদ্ভট সব জায়গায় লুকিয়ে রাখে। কেন রাখে তারা নিজেরাই জানে না। একটা কাজের জিনিস লুকিয়ে রাখতে হবে কেন, সেটাই আমি বুঝি না। কাজের জিনিস পেছনে রেখে মানুষ অকাজের জিনিস দিয়ে ঘর সাজায়। বড় বড় পুতুল আর পিয়ানো সাজিয়ে রাখে।

কিচেনে খোঁজাখুঁজি শেষ করে সে বেডরুমের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। মাথা নেড়ে বলল, সেদিন একটা বাড়িতে এ রকম হয়েছিল। সেই বাড়ির লোকজন সুইচ প্যানেলটাকে একটা ভয়ংকর জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিল। জায়গাটা দেখে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, আমি থ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম।

কথাটা বলে লোকটা কিছু বুঝে ওঠার আগেই বেডরুমের দরজায় ধাক্কা দিল। আমি বাধা দেওয়ার আগেই সে ভেতরে ঢুকে গেল। আমি ভেতরে ঢুকে দেখলাম, লোকটা হাঁ করে বিছানার দিকে তাকিয়ে আছে। বিছানার দুই পাশে ২০৮ এবং ২০৯ শুয়ে আছে। মাঝখানের জায়গাটা ফাঁকা। তাদের শরীরে কোনো কাপড় নেই। বোঝাই যাচ্ছে, মাঝখানের ওই ফাঁকা জায়গাটা আমার জন্য বরাদ্দ। উঠে গিয়ে দরজা খোলার আগে আমি ওখানে শুয়ে ছিলাম। লোকটাকে থ হয়ে দাঁড়িয়ে যেতে দেখে যমজ দুই বোনও মোটামুটি স্ট্যাচু হয়ে গেল। কাপড়চোপড় ছাড়া ওই অবস্থাতেই তারা লোকটার দিকে তাকিয়ে রইল। রুমে মোটামুটি তিনজন স্ট্যাচু অবস্থায়। তার মধ্যে আমি। এভাবে পনেরো সেকেন্ড কেটে গেল।

বাধ্য হয়ে একসময় পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে

নিলাম। যমজ দুই বোনকে বললাম, তোমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। উনি টেলিফোন কোম্পানি থেকে এসেছেন।

বিছানার চাদরটা টেনে তারা তাদের শরীর ঢাকল।

হাই, তাদের একজন বলল।

ওয়েলকাম, সঙ্গে আরেকজন সুর মেলাল।

আপনারা ভালো আছেন? লোকটা বিড়বিড় করে বোকার মতো বলল।

আমি দুই বোনের দিকে তাকিয়ে বললাম, তিনি এসেছেন আমাদের সুইচ প্যানেলটা বদলে দেওয়ার জন্য।

সুইচ প্যানেল!

সেটা আবার কী?

সার্কিটকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একধরনের মেশিন, আমি বললাম। কিন্তু বলার সময় বুঝতে পারছিলাম, তাদের মাথায় কিছু ঢোকেনি। আমি মোটামুটি হাল ছেড়ে দিয়ে লোকটার দিকে তাকালাম।

সে বলতে শুরু করল, সুইচ প্যানেল হচ্ছে এমন একটা জায়গা, যেখানে টেলিফোনের সবগুলো সার্কিট এসে জড়ো হয়। অনেকগুলো ছোট ছোট বাচ্চা কুকুর যেভাবে করে মায়ের কাছে এসে জড়ো হয়, অনেকটা সে রকম। বুঝতে পেরেছেন?

না, ২০৮ বলল।

না, ২০৯ বলল।

আচ্ছা ঠিক আছে। আমরা ধরে নিচ্ছি যে মা কুকুরটা তার বাচ্চাদের বড় করছে। এখন সে যদি মরে যায়, তার বাচ্চাগুলোর যত্ন নেওয়ার মতো কেউ থাকবে না। তখন সেই ছোট ছোট বাচ্চাও সব মরে যেতে পারে, তাই না?

হ্যাঁ।

হ্যাঁ।

তাই যদি সে বুঝতে পারে তার মরার সময় হয়ে এসেছে, সে বাচ্চাগুলোর জন্য একটা নতুন মা ঠিক করে যাবে। তাই না?

হ্যাঁ।

হ্যাঁ।

এই নতুন মা হচ্ছে আমাদের নতুন সুইচ প্যানেল। পুরোনো সুইচ প্যানেলটা বদলে দিয়ে আমরা নতুন সুইচ প্যানেল বসাব। এতে করে টেলিফোনের

লাইনগুলো মরে যাবে না। সেজন্যই আমি এসেছি। আমি খুবই দুঃখিত। আপনারা সবাই ঘুমোচ্ছিলেন। আমি খুব বাজে একটা সময়ে এসেছি।

কোনো সমস্যা নেই।

আমরা সুইচ প্যানেল বদলানো দেখতে চাই।

লোকটার চেহারা দেখে মনে হলো, সে বেশ নির্ভার হয়ে পড়েছে। মুখে হাসি ফুটল। সে বলল, ঠিক আছে। আপনারা দেখবেন। কিন্তু তার আগে সুইচ প্যানেলটা কোথায় রাখা আছে, সেটা খুঁজে বের করতে হবে। এই রুমটায় একটু খুঁজে দেখি।

খোঁজাখুঁজির দরকার নেই, ২০৮ বলল।

ওটা ক্লজেটের মধ্যে আছে, ২০৯ বলল।

আমি অবাক হয়ে তাদের দিকে তাকালাম। বললাম, তোমরা কী করে জানো? আমি তো জানতাম না।

এ আর এমন কী!

আমরা জানি।

কাজটা সত্যি সত্যি দশ মিনিটে হয়ে গেল। এর মধ্যে দুই বোন চাদরের নিচে তাদের জিনস আর সোয়েট শার্ট পরে নিয়েছে। বিছানা থেকে উঠে এসে পুরোটা সময় খুব মনোযোগ দিয়ে লোকটার কাজ দেখল। কখনো কখনো নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কিছু একটা বলল। ফিক করে হেসে উঠল। কাজ শেষ হওয়ার পর দুজন গিয়ে সবার জন্য কফি বানিয়ে আনল। আমরা সবাই মিলে বসে কফি খেলাম। সঙ্গে ড্যানিশ।

আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ, লোকটা বলল, আসলে খুব খিদে পেয়েছিল। সকালে ব্রেকফাস্ট করা হয়নি।

আপনার বাড়িতে কেউ নেই নাশতা বানিয়ে দেওয়ার মতো? ২০৮ প্রশ্ন করল।

কেউ মানে?

কেউ মানে ... বউ, ২০৯ বলল।

নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সে রোববার সারা দিন ঘুমোয়।

বেচারা, ২০৯ বলল।

না ঠিক আছে, লোকটা বলল, আসলে আমি রোববার কাজে বের হই না।

তাই সমস্যা হয় না। কিন্তু আজ একটা বিশেষ কারণে বের হতে হয়েছে।

আমার লোকটার জন্য একটু মায়া হলো। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার কি বেশি খিদে পেয়েছে? একটা ডিম সেদ্ধ করে দেব?

না, তার দরকার নেই।

সমস্যা নেই, আপনি যদি খান তো আমরা সবাই আপনার সঙ্গে খাব। সবার জন্যই ডিম সেদ্ধ করা হবে।

তাহলে ঠিক আছে। খাওয়া যেতে পারে। খেয়াল রাখবেন, খুব বেশি যেন সেদ্ধ না হয়ে যায়। আর বাসায় বিট লবণ থাকলে হালকা লবণ ছিটিয়ে দেবেন।

বিট লবণ দিয়ে হাফ বয়েল ডিম খেতে খেতে সে বলল, একটা কথা মনের মধ্যে ঘুরছে। যদি কিছু মনে না করেন, সেটা আমি বলতে চাই।

বলতে পারেন, বললাম আমি।

আমি একুশ বছর ধরে বাড়িতে বাড়িতে টেলিফোনের কাজ করি। কিন্তু এ রকম অদ্ভুত জিনিস কখনো দেখিনি।

কী রকম অদ্ভুত?

এই যে আপনি একসঙ্গে দুই যমজ বোনের সঙ্গে বিছানায় যাচ্ছেন। দুটো মেয়েকে একসঙ্গে সামলানো খুব কঠিন হওয়ার কথা।

খুব একটা কঠিন না, বললাম আমি।

সত্যি?

সত্যি।

কী করে পারেন? আমি তো একজনকেই সামলাতে পারি না।

ও পারে। কারণ ওর শরীরের চাহিদা অনেক বেশি, ২০৮ বলল।

একটা জন্তুর মতো, ২০৯ সুর মেলাল।

লোকটা মাথা নেড়ে জ্ঞানীর মতো বলল, এখন একটু পরিষ্কার হচ্ছে বিষয়টা।

লোকটা সম্ভবত পুরোপুরি বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। সে চলে যাওয়ার পর আবিষ্কার করলাম, পুরোনো সুইচ প্যানেলটা ভুলে ফেলে রেখে গেছে। অবশ্য সেটা আমাদের উপহার হিসেবেও দিয়ে যেতে পারে। আমরা তাকে ব্রেকফাস্ট তৈরি করে খাইয়েছি। বিনিময়ে সে আমাদের পুরোনো সুইচ প্যানেলটা গিফট করে গেছে।

সে যা-ই হোক, যমজ বোনেরা সুইচ প্যানেলটা পেয়ে ভারি খুশি হলো। তারা সারা দিন ওটা নিয়ে খেলল। তাদের মধ্যে একজন মা কুকুরের ভূমিকায় অভিনয় করল আর একজন হলো বাচ্চা কুকুর। আমি কিছুক্ষণ তাদের খেলাটা বোঝার চেষ্টা করলাম। কিন্তু আগামাথা কিছু বুঝে উঠতে পারলাম না।

বাধ্য হয়ে আগের দিন অফিস থেকে নিয়ে আসা একটা অনুবাদের কাজে হাত দিলাম। অফিসে পার্টটাইম জব করছিল যেসব ছেলেমেয়ে, তারা মোটামুটি একধরনের রাফ ড্রাফট তৈরি করে দিয়েছিল। তাই কাজটা করতে খুব একটা অসুবিধা হলো না। দুপুর তিনটা পর্যন্ত তরতর করে কাজ এগিয়ে গেল। তারপর একটু একটু করে আমার ব্যাটারি ডাউন হতে শুরু করল। কাজের গতি কমে গেল। বিকেল চারটা যখন বাজল, ব্যাটারি পুরোপুরি শেষ। নতুন করে আমি একটা লাইনও লিখতে পারলাম না।

শরীরটা এলিয়ে দিয়ে একটা সিগারেট ধরালাম। ছাদের দিকে তাকালাম। সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ ... বছরটা কি সত্যি সত্যিই আছে? নাকি সেটা আমার একটা কল্পনা ... ? আমি এভাবে করে আগে কখনো ভাবিনি। ভাবনাটা আমার কাছে একদমই নতুন মনে হলো।

তুমি ঠিকঠাক আছ, ২০৮ জিজ্ঞেস করল।

একটু টায়ার্ড লাগছে। কফি খেতে ইচ্ছে করছে, বললাম আমি।

তারা দুজন রান্নাঘরে ছুটে গেল। কফি বানিয়ে আনার পরে আমরা তিনজন ফ্লোরে বসে কফি খেলাম।

এখন একটু ভালো লাগছে? ২০৯ জানতে চাইল।

একটু, বললাম আমি।

জিনিসটার অবস্থা আসলেই ভালো না। বোধ হয় মারা যাবে, ২০৮ বলল।

কীসের কথা বলছ?

সুইচ প্যানেল, ২০৯ বলল।

মা কুকুর, ২০৮ সুর মেলাল।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, তোমাদের তাই মনে হচ্ছে?

ওটা মরে যাচ্ছে।

সত্যি সত্যি মরছে।

সে ক্ষেত্রে আমাদের কী করা উচিত? জানতে চাইলাম আমি।

আমরা জানি না, তারা দুজনে একসঙ্গে মাথা নেড়ে বলল।

একটা কাজ করা যায়, বললাম আমি, চলো গলফ কোর্সে হেঁটে আসি। আজ রোববার। সুতরাং প্রচুর হারানো বল খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

বিকেলজুড়ে আমরা তিনজন গলফ কোর্সে হেঁটে বেড়ালাম। হারানো বল খুঁজলাম। আমি শিস দিয়ে 'ইটস সো পিসফুল ইন দ্য কান্ট্রি' বাজালাম। যমজ দুই বোন সুরটা খুব পছন্দ করল। কিন্তু আমরা একটা বলও খুঁজে পেলাম না। সম্ভবত সেদিন টোকিওর সব বিখ্যাত লো হ্যান্ডিক্যাপ গলফার সেই মাঠে খেলতে এসেছিল। তাদের বলগুলো একের পর এক লক্ষ্যে পৌঁছেছে। একটা বলও এদিক-সেদিক উড়ে যায়নি বা হারায়নি। অথবা তারা সঙ্গে করে শিকারি কুকুর নিয়ে এসেছিল। কুকুরটা দৌড়ে গিয়ে হারানো বল খুঁজে নিয়ে এসেছে।

মন খারাপ করে আমরা অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এলাম।

৪

যে বন্দর-শহরে র‍্যাট বেড়ে উঠেছিল, সেখানে একটা বাতিঘর ছিল। কেউ তার কোনো নাম দেয়নি। জাহাজঘাটার একদম শেষ মাথায় সমুদ্রসৈকতের সঙ্গে বেশ একটা কৌণিক অবস্থান তৈরি করে দাঁড়িয়ে ছিল বাতিঘরটি। অনেকটা নিঃসঙ্গ শেরপার মতো। মাথাটা আকাশের দিকে তুলতে চেয়েছিল, কিন্তু মেরেকেটে দশ ফিট মতো তুলতে পেরেছে। সেই হিসাবে তাকে খুব একটা লম্বা যাবে না। বন্দরের মাছ ধরা নৌকাগুলোর জন্য এই বাতিঘরই ছিল ভরসা।

যে সময়ের কথা বলছি, তখন এলাকাটায় জেলে নৌকা দেখা যেত। জেলেরা বেশ খেয়ে-পরে বেঁচে ছিল। জায়গাটায় এত দূষণ ছিল না তখন। পানিতে ময়লা-আবর্জনা জমেনি। মাছেরা উপকূলজুড়ে দল বেঁধে ঘুরে বেড়াত। পোতাশ্রয় বলে কিছু সেখানে ছিল না। তার বদলে জেলেরা গাছের গুঁড়ি বসিয়ে তার ওপর দিয়ে দড়ি বেঁধে নৌকাগুলো সৈকতে টেনে তুলত। তিনটা জেলে কুটির ছিল সৈকতে। সকালবেলায় তারা শুঁটকি বানানোর জন্য রোদে মাছ শুকাতে দিত। একটা সময় বন্দরে ভিড় বাড়ল। দূরদূরান্ত থেকে বড় বড় মালবাহী জাহাজ আসতে শুরু করল। পানিতে ময়লা-আবর্জনা আর তেলবাহী জাহাজের বর্জ্য জমল। দল বেঁধে মাছগুলো সব গভীর সমুদ্রে চলে

গেল। জেলেরাও এলাকাটা ছেড়ে দিল।

তাদের চলে যাওয়ার পেছনে মাছ কমে যাওয়া নিশ্চয়ই বড় একটা কারণ। কিন্তু আরও দুটো কারণ ছিল। স্থানীয় লোকজন তাদের সভ্য সমাজে প্রবেশের ছাড়পত্র দিতে চায়নি। তা ছাড়া তারা সরকারি জমিতে কুটির তৈরি করেছিল। কাজটা আর যা-ই হোক, বৈধ নয়। দিন দিন তাদের ওপর সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় চাপ বাড়তে লাগল। সবকিছু মিলিয়ে একদিন তারা চলে গেল। ১৯৬২ সালের ঘটনা এগুলো। কেউ জানত না, জায়গাটা ছেড়ে কোথায় চলে গেল জেলেরা। যে তিনটা কুঁড়েঘর তোলা হয়েছিল, সেগুলো একসময় ধসে গেল। জেলে নৌকাগুলো 'নেই' হয়ে যাওয়ার পর যে শূন্যস্থান তৈরি হয়েছিল, বড়লোকদের প্রমোদতরি এসে সে জায়গা পূরণ করে ফেলল।

বাতিঘরটা ছিল কালো রঙের একটা সিলিন্ডারের মতো। সোজা ওপরে উঠে গেছে। চূড়ায় ঘণ্টার মতো দেখতে একটা বাতি বাঁধা। সূর্য ডুবতে শুরু করলে দিনের আলো একটু একটু করে ফিকে হয়ে গাঢ় নীল বর্ণের হয়ে যেত। তখনই বাতিঘরের ঠিক মাথায় একটা কমলা রঙের আলো জ্বলে উঠত এবং সেই আলোটা ধীরে ধীরে ঘুরত। যে মুহূর্তে দিনটা শেষ হয়ে রাতে গিয়ে পড়ত, সেই মুহূর্তেই যেন বাতিঘরটা জীবন্ত হয়ে উঠত।

ছোটবেলায় র‍্যাট প্রায় প্রতিদিনই বিচে যেত ওই বিশেষ মুহূর্তটার সাক্ষী হতে। নিজের চোখে একটাবার দেখতে চাইত। সন্ধ্যাবেলায় হঠাৎ করে জ্বলে ওঠা বাতির দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকাত সে। শেষ বিকেলের ঢেউগুলো একসময় মরে যেত। আর সে বালু বিছানো সৈকত ধরে একা একা হাঁটত। জাহাজঘাটার পথ ধরে বাতিঘর পর্যন্ত পুরো পথ সে পাথর গুনতে গুনতে সামনে এগোত।

বাতিঘরের কাছে পৌঁছে জেটির পাথরের সিঁড়িতে গিয়ে বসত সে। ততক্ষণে আকাশের রং গাঢ় নীল হয়ে গেছে। আকাশের সেই অন্তহীন নীল রং দেখে নিজেকে বড় অসহায় মনে হতো তার। কোনো এক অজানা কারণে পা দুটো ঠকঠক করে কাঁপত। মনে হতো ভয়ে কাঁপছে। অনেকক্ষণ ধরে র‍্যাট সামনের দৃশ্যটা উপভোগ করত সে সময়। সমুদ্রের সামনে বসে সে বিষাদের তল খুঁজে পেত না। সে পেছনে ফিরে নিজের জগৎটার দিকে তাকাত। সামনের গভীর সমুদ্রের সঙ্গে সে জগতের অনেক দূরত্ব।

পেছনে সাদা বালুর সৈকত। সৈকত যেখানে শেষ, সেখানে মাটি ফুঁড়ে পাইনগাছগুলো উদয় হয়েছে। গাছগুলো অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে।

তারও পেছনে ধূসর নীলচে পাহাড়, একদম দিগন্ত পর্যন্ত। বাঁ দিকে নতুন গড়ে ওঠা বন্দরটা ঘুমিয়ে গেছে ততক্ষণে। সেখানে বড় বড় ক্রেন সারি বেঁধে রাখা। দূর থেকে মনে হয়, ছোট ছোট হলুদ দানব শরীরটা একটু ভাঁজ করে দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তার দুপাশে উঁচু গুদাম আর বড় বড় বিল্ডিং। গুদামের জানালাগুলো বেশ উঁচুতে, দেয়ালে শ্যাওলা জমে আছে। ডান দিকে কোস্ট লাইন বরাবর শান্ত আবাসিক এলাকা। সেই জাহাজঘাটায় দাঁড়িয়ে দশ বছর বয়সী র‍্যাটের মনে হতো, সে যেন একেবারে পৃথিবীর কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে। যেকোনো মুহূর্তে সেখান থেকে টুপ করে পড়ে যেতে পারে।

র‍্যাটের ছেলেবেলার বিকেল এবং সন্ধ্যাগুলো সেখানেই কেটেছে। বসন্তের শুরু থেকে শরতের শেষ পর্যন্ত প্রতিদিন সে ওখানে হাঁটতে যেত। সমুদ্রের ঢেউ যখন ফুঁসে উঠত, সেগুলো এসে তার পা ভিজিয়ে দিত। শোঁ শোঁ বাতাস ভেদ করে র‍্যাট যেন স্বপ্নের মধ্য দিয়ে হেঁটে যেত বাতিঘরের দিকে। সেই রাস্তাটা র‍্যাট নিজের হাতের তালুর মতো করে চেনে।

অনেক বছর পরে র‍্যাটের সঙ্গে এক মেয়ের বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়। মেয়েটা সৈকতের পাশেই একটা অ্যাপার্টমেন্টে থাকে। জেটি থেকে খুব একটা বেশি দূরে নয় তার বাসা। র‍্যাট যখনই ওই মেয়েটার বাসায় যায়, তখনই যেন তার শৈশবের গন্ধ টের পায়। ছোটবেলায় যে জায়গাটায় জেলেদের কুটির ছিল, সেখানেই অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংটা গড়ে উঠেছে। সৈকতের একদম কাছেই।

সেই অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের বাগানে লাল রঙের সাউথ আমেরিকান লিলি ফুটে আছে। মেয়েটা তিনতলায় থাকে। যখন জোরে বাতাস বয়ে যায়, ধুলো উড়ে এসে তিনতলার জানালা দিয়ে তার বাসায় ঢোকে। ছোট্ট সুন্দর একটা দক্ষিণমুখী অ্যাপার্টমেন্ট, আশ্চর্য রকম বিষণ্ন।

সেখানে ঢুকলেই নাকে বিষাদের গন্ধ পেত র‍্যাট। সেই মেয়েটা বলত, সাগরের কারণেই তার বাসায় এ রকম বিষণ্নতা বাসা বেঁধেছে।

আসলে জায়গাটা সাগরের খুব কাছে, সে একবার বলেছিল, বাড়িতে বসেই আমি সাগরের গন্ধ পাই। ঢেউয়ের গন্ধ, বাতাসের গন্ধ, জোয়ার-ভাটার গন্ধ, মাছের গন্ধ ...।

কিন্তু আমি তো কোনো মাছের গন্ধ পাচ্ছি না, র‍্যাট বলেছিল।

তুমি পাচ্ছ না, কারণ তুমি এখানে থাকো না। যদি আমার মতো এখানে

থাকতে, তুমিও পেতে।

কথাটা বলতেই জোরে বাতাস বয়ে গেল। সৈকত থেকে ধুলো উড়ে এসে জানালায় বাড়ি গেল। র‍্যাট টের পেল, পৃথিবীর বিষণ্ন এক প্রান্তরে এসে পড়েছে সে।

৫

কলেজে পড়ার সময় আমি যে অ্যাপার্টমেন্টে থাকতাম, সেই বিল্ডিংয়ে কোনো বাসায় ফোনের লাইন ছিল না। কিন্তু তাতে আমাদের কোনো অসুবিধা হয়নি। সে সময় বেশ অল্প জিনিসপত্রেই আমাদের কাজ চলে যেত। কেয়ারটেকারের অফিস ছিল দোতলায়। পুরো বিল্ডিংয়ের একমাত্র টেলিফোন সেটটা থাকত সেই অফিসের সামনে একটা টেবিলে। স্পষ্ট মনে হচ্ছে, কটকটে গোলাপি রঙের একটা ফোনসেট। সেই টেবিলটাও আমরা ধার করে এনেছিলাম পাশের প্রাইমারি স্কুল থেকে।

টেলিফোন সুইচ প্যানেল বলে যে একটা জিনিস পৃথিবীর বুকে থাকতে পারে এবং সেটা পুরোনো হয়ে গেলে বদলে নতুন একটা প্যানেল বসাতে হয়, এ ধরনের কোনো সৃষ্টিশীল চিন্তা আমাদের মাথায় আসেনি। তখন ছিল একটা শান্তির দুনিয়া। টেলিফোন সুইচ প্যানেলের মতো খটমট বিষয়গুলো ছাড়াই মানুষ বেশ শান্তিতে থাকত।

মানুষজনের কাছে ওই ফোন নম্বরটা দেওয়া থাকত। কোনো প্রয়োজনে কেউ ফোন করলে কেয়ারটেকারের ডেকে দেওয়ার কথা। কিন্তু অফিসে বসে থাকার মতো গুরুত্বহীন কাজে কেয়ারটেকারের মন ছিল না। বেশির ভাগ সময়ই সে অফিসে থাকত না। ফোন রিসিভ করার মহান দায়িত্বটা আমাদের মধ্যে কেউ নিজের কাঁধে তুলে নিত। অন্য প্রান্তের মানুষটা ফোনে কাকে চাচ্ছে, সেটা জানার পর আমরা চিৎকার করে তাকে ডাকতাম। অথবা তার রুম কাছাকাছি হলে গিয়ে খবর পৌঁছে দিতাম। অবশ্য কোনো কোনো সময় কেউই ফোন রিসিভ করত না। রাত দুটোর সময় ফোন বাজলে ওটা তোলার মতো খুঁজে পাওয়া যেত না কাউকে।

একটা হাতি যখন নিশ্চিত হয়ে যায় যে সে মরে যাচ্ছে, তখন পাগলের মতো ডাকতে থাকে। আপনি সেই ডাক শুনতে পাবেন, কিন্তু সাড়া দেবেন না। ফোনটা মাঝেমধ্যে সেই মৃতপ্রায় হাতির মতো চিৎকার করে সবাইকে ডেকে যেত। কিন্তু কেউ রিসিভ করত না। আমি একবার বত্রিশবার পর্যন্ত ফোনের রিং গুনেছিলাম। তারপর সেটা মরে যায়। 'মরে যায়' শব্দটা আমি ইচ্ছে করেই বললাম। ফোনটা শেষবারের মতো বেজে যখন থেমে গেল, তখন করিডরজুড়ে এক ভয়াবহ নীরবতা নেমে এসেছিল। আমরা সবাই চুপচাপ শুয়েছিলাম বিছানায়। আমাদের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। মনে হচ্ছিল, আমরা সেই নীরব এবং মৃত ফোন কলের সাক্ষী।

গভীর রাতের ফোনগুলো মনকে সব সময় দুর্বল করে দেয়। ফোনটা বাজবে এবং কেউ সেটা ধরে নিচু স্বরে কথা বলতে শুরু করবে, আচ্ছা বাদ দাও না ... না তুমি ভুল বুঝছ ... আমি যেটা বলছি, সেটাই সত্যি। মিথ্যে বলে আমার কী লাভ? ... যা হয়ে গেছে, তা তো হয়েই গেছে, না? ... অবশ্যই আমার অনেক কিছু যায় আসে ... দেখো, তুমি যা খুশি তাই ভাবতে পারো। কিন্তু আমার সময় লাগবে ... আমি এত কিছু ফোনে ব্যাখ্যা করতে পারব না।

মানুষের কথা শুনলে মনে হতো তারা খুবই সমস্যায় আছে। তাদের সমস্যাগুলো আকাশ থেকে বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ছে। এবং তারা ছোটাছুটি করে সেগুলো ধরার চেষ্টা করছে। নিজেদের মধ্যে মারামারি করে সমস্যাগুলো পকেটে পুরছে। আমি নিজেও এই কাজটা করতাম। আমরা কেন এ রকম করতাম আজও বুঝতে পারিনি। সম্ভবত আমরা সমস্যাগুলোকে সমস্যা বলে বুঝতে পারতাম না, অন্য কিছু ভেবে ভুল করতাম।

সে সময় টেলিগ্রাম বলে আরেকটা জিনিস ছিল। হঠাৎ করে ভোর চারটার সময় একটা মোটরবাইকের গর্জন শুনতে পেতাম অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে। করিডোরে জোরে পায়ের শব্দ গিয়ে কোনো একটা দরজায় থেমে যেত। দরজায় জোরে জোরে আঘাতের শব্দ পেতাম। মোটরবাইকের সেই আগন্তুককে আমার মনে হতো মৃত্যুর দেবতা। মানুষ সে সময় কোনো অদ্ভুত কারণে জীবনকে বেশি দূর এগিয়ে নিতে চাইত না। অল্প বয়সে মরার জন্য তারা নানা ধরনের ফন্দিফিকির বের করেছিল। মৃত্যুদেবতা বাইকে করে আমাদের কাছে এসে সে খবরগুলো পৌঁছে দিত।

সে বছর আমরা প্রচুর দুর্যোগের মুখোমুখি হলাম। কেউ সুইসাইড করল,

কেউ পাগল হয়ে গেল, কেউ আগুনে পুড়ল এবং আমরা নিজেদের মধ্যে প্রচুর ঝগড়াঝাঁটি, মারামারি করলাম। ১৯৭০ ছিল সে রকম একটা বছর। আপনি যদি মনে করেন জীবন ছন্দময় এবং সেটা একটা নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে সামনে এগিয়ে যাবে, তাহলে ভুল ভেবেছেন। ১৯৭০ সালে আমরা এ শিক্ষাই পেয়েছি।

দোতলায় কেয়ারটেকারের অফিসের ঠিক পাশের রুমটাই ছিল আমার। লম্বা চুলের মেয়েটা থাকত তিনতলায়। সিঁড়ির ঠিক উল্টো দিকে তার রুম। সে সময় 'কার সবচেয়ে বেশি ফোন আসে'—এ রকম একটা প্রতিযোগিতা যদি আয়োজন করা যেত, মেয়েটা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হতো। যাওয়া-আসার পথে সব সময় দেখতাম মেয়েটা ফোন কানে নিয়ে বসে আছে। তাকে কখনো সেখানে না দেখলে বেশ দুশ্চিন্তা হতো। মনে হতো, পৃথিবীতে কোথাও খুব মারাত্মক একটা দুর্যোগ ঘটে গেছে। কিছু একটা স্বাভাবিক নেই।

সব ধরনের লোক তাকে ফোন করত। এটা আমার অনুমান নয় বা বানিয়ে বলছি না। তার কথা বলার টোন থেকে ব্যাপারটা বোঝা যেত। অনেকগুলো স্পেশাল গলার স্বর ছিল তার। মানুষ বুঝে স্বরগুলো সে ব্যবহার করত। কখনো তার গলা দিয়ে নম্র-ভদ্র সুর বের হতো, একদম ফরমাল ধরনের কথাবার্তা বলত। আবার কখনো সে রেগে যেত। মাঝেমধ্যে নিচু স্বরে এমনভাবে কথা বলত, মনে হতো খুব দুঃখ পেয়েছে।

অবাক করা ব্যাপার, তার নামটা আমার আজ আর মনে নেই। শুধু মনে আছে, নামটা ছিল খুবই কমন ধরনের। যদিও সহস্রবার এই নামটা আমি শুনেছি। আমার রুমের পাশেই যেহেতু ফোনটা ছিল, মাঝেমধ্যে আমাকে সেটা রিসিভ করতে হতো। অবধারিতভাবে অনেক সময় আমি ওই মেয়ের ফোন তুলেছি। তার নাম ফোনের ওই পাশের মানুষের মুখে শুনেছি।

সে যখন রেগে যেত, তখনো উঁচু স্বরে কথা বলত না। গলার স্বর সব সময়ই নিচু থাকত। ফিসফিস করে কথা বলত, তার পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেও কিছুই বোঝা যেত না। ফোনের অপর প্রান্তের মানুষ নিশ্চয়ই বুঝতে পারত। এই অসাধারণ কথা বলার স্টাইল সে কী করে আয়ত্ত করেছিল আমার জানা নেই। তবে নিঃসন্দেহে সেটা খুবই কার্যকর। মেয়েটার চেহারা কাটা কাটা, খুবই আকর্ষণীয়। কিন্তু একই সঙ্গে বেশ খানিকটা বিষণ্ন। যাওয়া-আসার পথে আমাদের দেখা হয়ে যেত প্রায়ই। কিন্তু তার সঙ্গে কখনো কথা হয়নি। সে যখন

আমার পাশ দিয়ে হেঁটে যেত, চেহারা দেখে মনে হতো সাদা হাতির পিঠে চড়ে জঙ্গলের সরু রাস্তা দিয়ে চলেছে সে। ধুলোর পৃথিবীতে তার পা পড়েনি।

মেয়েটি মোটামুটি ছয় মাসের মতো ওই অ্যাপার্টমেন্টে ছিল। শরতের শুরু থেকে শীতের একদম শেষ পর্যন্ত।

আগেই বলেছি, আমার রুমের পাশেই ফোনটা ছিল। মাঝেমধ্যেই আমি তাকে ডেকে দিতাম। সোজা তিনতলায় উঠে যেতাম। তার দরজায় নক করে বলতাম, তোমার ফোন ...।

এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে সে বলত, ধন্যবাদ।

সে যেমন সারা জীবনে আমাকে 'ধন্যবাদ' ছাড়া আর কিছু বলেনি, আমিও তেমন তাকে 'তোমার ফোন' শব্দ দুটো ছাড়া আর কোনো শব্দ বলিনি।

পরে অবশ্য কথা হয়েছিল মেয়েটার সঙ্গে। কিন্তু সে কথা সামনে বাড়ার সুযোগ ছিল না।

সে সময়ে আমি খুব একা ছিলাম। তেমন কোনো বন্ধুবান্ধব ছিল না। দিন শেষে রুমে ফিরে আসতাম। কাপড়চোপড় ছাড়ার পর বিছানায় শুয়ে মনে হতো চামড়া ফেটে হাড্ডিগুলো বেরিয়ে আসবে এবং উড়ে যাবে। যেন কোনো রহস্যময় শক্তি সেগুলোকে শরীরের খাঁচা থেকে বের করে ফেলবে। করিডরে ফোন বেজে উঠলেই আমি ভাবতাম, পৃথিবীতে মানুষের এত কী কথা ...। কেউ অন্য কাউকে কিছু একটা বলতে চাইছে। কী দরকার আছে সেটা বলার? গোটা পৃথিবীতে একজন মানুষও ছিল না যে আমাকে কিছু বলতে চায়। আমিও কারও কাছ থেকে কিছু শুনতে চাইনি।

সবাই কমবেশি নিজেদের মতো করে একটা জগৎ তৈরি করে তার মধ্যে বাস করার চেষ্টা করত। আমিও তা-ই করতাম। কারও চিন্তাভাবনা যদি আমার থেকে একটু বেশি আলাদা হতো, সেটা আমাকে প্রায় পাগল বানিয়ে ফেলত। আবার কারও চিন্তাভাবনা যদি একটু বেশি কাছাকাছি হতো, সেটাও শান্তি দিত না। খচখচ করে কাঁটার মতো বিঁধত মনে। একধরনের দুঃখবোধ এসে গ্রাস করত মনটাকে। সে সময় জীবনটা এ রকম উদ্ভট ছিল।

আমি শেষবার তার জন্য ফোনটা ধরেছিলাম শীতের শেষে। সেদিন ছিল শনিবার। মার্চ মাসের এক মেঘহীন সকালে ফোনটা এল। ঘড়িতে তখন দশটা

মতো বাজে। আমি বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে আসা শীতের মিষ্টি রোদ পোহাচ্ছিলাম। আমার চোখ ছিল পাশের বাড়ির উঠোনে। সেখানে তারা বাঁধাকপি চাষ করেছে। কালো মাটির ওপরে সাদা সাদা তুষার জমে আছে। আগের রাতে সে বছরের শেষ তুষারঝড় হয়ে গেছে। আমি ফোনের শব্দ শুনতে পেলাম।

দশবার ফোন বাজল। কেউ ধরল না। পাঁচ মিনিট পর আবারো সেটা বাজতে শুরু করলে আমি গিয়ে ফোনটা ধরলাম।

'...' কে পাওয়া যেতে পারে? একটা পুরুষ কণ্ঠ বলল। গলার স্বরে কোনো ওঠানামা নেই।

আমি সিঁড়ি বেয়ে উঠে গিয়ে দরজায় নক করে বললাম, তোমার ফোন ...।

ধন্যবাদ, ও প্রান্ত থেকে উত্তর এল।

রুমে ফিরে আমি বিছানায় শুয়ে পড়লাম। ছাদের দিকে তাকিয়ে কান পেতে শুনতে পেলাম সিঁড়ি বেয়ে মেয়েটার নিচে নেমে আসার শব্দ। মনে মনে কল্পনা করলাম, সে ফিসফিস করে কথা বলছে। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, সেদিন সে মাত্র পনেরো সেকেন্ড মতো কথা বলল। অকল্পনীয় একটা ব্যাপার! এর আগে এত অল্প সময় নিয়ে সে কখনো কথা বলেনি। আমি ফোনের রিসিভার রেখে দেওয়ার শব্দ পেলাম। তারপর একেবারেই সবকিছু নীরব হয়ে গেল। মেয়েটার সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেলাম না।

বেশ খানিকক্ষণ পর একজোড়া পায়ের শব্দ আমার দরজার দিকে এগিয়ে এল। দুবার নক করল সে। দুবার নক করার মধ্যে নিশ্বাস নেওয়ার সময় একটা বিরতি পড়ল। আমি দরজাটা খুলে দেখলাম, একটা মোটা সাদা সোয়েটার আর জিনস পরে সে দাঁড়িয়ে আছে। একবারের জন্য আমার মনে হলো, আমি বোধ হয় একটা ভুল করে ফেলেছি। ফোনটা সম্ভবত মেয়েটার না, অন্য কারও জন্য এসেছিল। মেয়েটা কিছুই বলল না। হাত দুটো বুকের কাছে ভাঁজ করে আমার চোখে তাকিয়ে রইল। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল, সে এক জাহাজডুবি যাত্রী। কোনোমতে একটা লাইফবোটে উঠে পড়েছে। ছলছল চোখে দূরে ডুবে যাওয়া জাহাজটা দেখছে। অথবা এর ঠিক উল্টোটাও হতে পারে। আমি নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারিনি।

ভেতরে আসতে পারি? বাইরে অনেক ঠান্ডা, সে বলল।

আমি দরজা ছেড়ে দিয়ে দাঁড়ালাম। সে ভেতরে ঢোকার পর দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। ভেতরে ঢুকে গ্যাস হিটারের সামনে তার হাত দুটো মেলে ধরল

সে। ভালো করে চারদিকে চোখ বুলিয়ে বলল, রুমটা একদম খালি লাগছে।

আমি মাথা নাড়লাম। রুমে আসলেই কিছু ছিল না। জানালার ঠিক পাশেই একটা বিছানা, যেটা একজন মানুষের জন্য একটু বেশি বড়, আবার দুজনের জন্য একটু বেশি ছোট। এটুকুই। আর কিছু নেই। জিনিসটা আমি নিজের পয়সায় কিনিনি। কলেজে এক পরিচিত ছেলে আমাকে ফ্রিতে দিয়েছিল। তাকে কোনোভাবেই আমার কাছের বন্ধু বলা যাবে না। সে আমাকে কেন এটা দিয়েছিল, তা আমি জানতাম না। এ নিয়ে আমাদের মধ্যে কোনো কথা হয়নি।

ছেলেটার বাবা বেশ বড়লোক। কলেজে থাকতে সে অ্যাকটিভ পলিটিকসে জড়িয়ে পড়ে। একবার একটা গণ্ডগোল হয় ক্যাম্পাসে। অন্য রাজনৈতিক দলের ছেলেদের হাতে সে বেশ মার খায়। ছেলেগুলো তাদের ভারী বুট দিয়ে আমার পরিচিত সেই ছেলেটার মাথায় জোরে জোরে লাথি মারে বেশ কয়েকটা। তাতে তার চোখের দৃষ্টি বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তখন পড়াশোনা ছেড়ে দেয় সে। কলেজ ছাড়ার আগে আমাকে এই বিছানাটা দিয়ে যায়।

ঠান্ডা লাগছে খুব। তোমার বাসায় গরম কিছু হবে? চা বা কফি? মেয়েটা বলল।

না, আমি মাথা নেড়ে বললাম।

আমার বাসায় চা-পাতা, কফি এগুলো কিছুই ছিল না। কখনো খেতে ইচ্ছে করলে দোকান থেকে চা-পাতা কিনে এনে পানি গরম করে খাব, সে উপায়ও ছিল না। কারণ আমার কেতলি কেনা হয়নি। শুধু কেতলি কেন, কিছুই নেই আমার। সকালবেলা উঠে শেভ করার জন্য গরম পানি দরকার হয়। একটা বেঢপ সাইজের সসপেন আছে। তাতে পানি গরম করে নিই।

তুমি একটু বসো, বলে সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল। রুম ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে গেল।

পাঁচ মিনিট পরে সে আবার ফিরে এল। হাতে একটা বিশাল সাইজের কার্ডবোর্ডের বাক্স। বাসাবাড়ি বদল করার সময় যে রকম বিশাল সাইজের কার্টনে মানুষ জিনিসপত্র ভরে, সে রকম একটা বাক্স সে দুহাতে বুকে চেপে ধরে রুমে ঢুকল। বাক্সটার ভেতরে টি-ব্যাগ এবং গ্রিন টি দুটোই আছে। যে পরিমাণ আছে তা দিয়ে মোটামুটি আমার ছয় মাস চলে যাবে। সঙ্গে দুই ব্যাগ বিস্কুট, চিনি, রান্নার কিছু হাঁড়ি-পাতিল, প্লেট আর পানি খাবার গ্লাস। আমি বেশ অবাক হয়ে মেয়েটার দিকে তাকালাম। সে কোনো কথা না বলে কার্ডবোর্ডের বাক্স

থেকে চা বানানোর একটা ছোট পাতিল বের করল এবং চুলায় পানি বসাল।

তুমি বেঁচে আছ কী করে? তোমাকে দেখে তো মনে হচ্ছে, তুমি রবিনসন ক্রুসো ... সে হেসে বলল।

খুব একটা কষ্ট হয় না, আমিও হেসে বলার চেষ্টা করলাম।

কষ্ট না হলেই ভালো।

আমরা দুজনে ব্ল্যাক টিতে চুমুক দিলাম।

তুমি এগুলো রেখে দিতে পারো, সে বলল।

আর একটু হলেই আমার মুখ থেকে চা ছলকে পড়ত। কোনোমতে সামলে বললাম, কিন্তু তুমি এগুলো আমাকে কেন দেবে?

সে মাথা নেড়ে বলল, মানুষকে ধন্যবাদ জানানোর আমার নিজস্ব একটা পদ্ধতি আছে। ধরে নাও, এভাবেই আমি তোমাকে থ্যাংকস দিতে চাই। কষ্ট করে তুমি আমার ফোনগুলো রিসিভ করেছ। এ জন্য তোমাকে থ্যাংকস।

কিন্তু এগুলো তোমার আর দরকার হবে না?

আমি কাল চলে যাচ্ছি, সে বলল, এগুলোর আর কোনো প্রয়োজন নেই আমার।

আমি কিছুক্ষণ ভাবলাম, মেয়েটা কেন চলে যাচ্ছে। ভেবে কোনো কূলকিনারা করতে পারলাম না।

কোনো ভালো খবর? নাকি, একটু বিরতি নিয়ে বললাম, খারাপ খবর?

সম্ভবত ভালো কিছু নয়, সে বলল, আমি পড়াশোনা করব না বলে ঠিক করেছি। কলেজ ড্রপ করছি। বাড়িতে ফিরে যাব কাল।

জানালা দিয়ে রুমের ভেতর যে সূর্যের আলো এসে পড়ছিল, সেটা যেন একটু ম্লান হয়ে গেল কয়েক মুহূর্তের জন্য। তারপর আবার একটু একটু করে উজ্জ্বল হতে শুরু করল।

কেন? বললাম আমি।

সে ম্লান হেসে বলল, তুমি নিশ্চয়ই সে গল্প শুনতে চাও না। আমাকে যদি অপশন দেওয়া হয়, আমি নিজেই শুনতে চাইব না। গল্পটা বেশ কষ্টের। সে রকম গল্প শুনলে তোমার মেজাজ খিঁচড়ে যেতে পারে। তখন হয়তো তুমি রাগ করে আমার প্লেট গ্লাস ব্যবহার করবে না।

• • •

পরদিন সকালেই ঠান্ডা বৃষ্টি শুরু হলো। ঝিরঝির করে পড়তে থাকা একঘেয়ে বৃষ্টি রেইনকোট ভেদ করে আমার সোয়েটার ভিজিয়ে দিল। আমার ডান হাতে ছিল মেয়েটার বিশাল স্যুটকেস। সেটা পুরোপুরি ভিজে গেল। বাঁ হাতে ধরা বড় স্টিলের ট্রাঙ্কের মধ্যেও পানি ঢুকল। মেয়েটার কাঁধে যে হ্যান্ডব্যাগ ছিল, সেটাও ভিজে চুপচুপ হয়ে গেল। ট্যাক্সি ড্রাইভার আমাদের কড়া গলায় জানিয়ে দিল, এসব ভেজা জিনিসপত্র সিটের ওপর রাখা যাবে না।

ট্যাক্সিটার ভেতরে দমবন্ধ করা গরম আর সিগারেটের কড়া গন্ধ। রেডিওতে একটা পুরোনো দিনের ট্র্যাডিশনাল ব্যালাড বাজছিল।

টোকিও শহরটাকে আমার এক দিনের জন্যও আপন মনে হয়নি, মেয়েটা বলল, প্রথম যেদিন এই শহরে এলাম, সেদিনই বুঝে গিয়েছিলাম, এই শহর আমাকে বুকে টেনে নেবে না।

আমি চুপ করে রইলাম।

সে বলল, এখানকার মাটি একদম কালো। নদীগুলো যাচ্ছেতাই। বড় কোনো পর্বত পর্যন্ত নেই। লিলিপুট সাইজের সব পাহাড় ... শহরটা তোমার কেমন লাগে?

তুমি যে দৃষ্টিতে ব্যাপারটাকে দেখেছ, বললাম আমি, আমি সেভাবে দেখিনি। আসলে টোকিওর প্রাকৃতিক দৃশ্য কেমন, এটা নিয়ে কখনো কোনো চিন্তা আমার মাথায় আসেনি।

সে ছোট করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাসল। বলল, সম্ভবত এ কারণেই তুমি টোকিওতে টিকে যাবে।

স্টেশনে পৌঁছে কাউন্টার থেকে টিকিট কিনে আমরা সরাসরি প্ল্যাটফর্মে গেলাম। ব্যাগগুলোকে নিচে রাখলাম।

তুমি আমার জন্য অনেক কষ্ট করলে, সে বলল, অনেক ধন্যবাদ। বাকিটুকু আমি একাই করতে পারব। তুমি রুমে ফিরে যেতে পারো।

তোমার বাড়ি কোথায়? জানতে চাইলাম আমি।

সীমান্তের উত্তর দিকে। একদম শেষ মাথায়।

ওখানে তো অনেক ঠান্ডা হওয়ার কথা।

হ্যাঁ, কিন্তু তাতে আমার কষ্ট হয় না। অভ্যাস হয়ে গেছে।

ট্রেনটা যখন ছেড়ে যাচ্ছিল, সে জানালা দিয়ে মাথা বের করল। আমার

দিকে হাত নাড়ল। আমি আমার ডান হাতটা ঠিক কান পর্যন্ত ওঠালাম এবং সেভাবে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। একটা সময় ট্রেন অনেক দূর চলে গেল, দৃষ্টির বাইরে। তখন হুট করে খেয়াল করলাম, তখনো আমি কান বরাবর হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছি। লজ্জা পেয়ে গেলাম একটু। হাতটা রেইনকোটের পকেটে চালান করে দিলাম।

সারা দিন বৃষ্টি পড়ল। তীব্র শীত নামল। ঠান্ডায় প্রায় জমে যাচ্ছিলাম আমি। দুই বোতল বিয়ার কিনে আনলাম স্থানীয় লিকার শপ থেকে। একটার মুখ খুলে মেয়েটার দেওয়া গ্লাসে ঢাললাম। গ্লাসের ওপরে একটা ছবি আঁকা। দুটো কমিক চরিত্র স্নুপি এবং উডস্টক সে ছবিতে খেলছে। তাদের হাতে একটা বেলুন ধরা। বেলুনে লেখা, সুখ হচ্ছে জীবনের উষ্ণতম বন্ধু।

রাত তিনটার দিকে হঠাৎ করে ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলে দেখলাম, যমজ দুই বোন গভীর ঘুমে ডুবে আছে। বাথরুমের জানালা গলে চাঁদের আলো এসে পড়েছে রুমে। সেই আলোয় সবকিছু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। কিছুক্ষণ সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ঘুম আর আসবে না বুঝতে পেরে নিঃশব্দে বিছানা থেকে নামলাম।

রান্নাঘরে গিয়ে ঢক ঢক করে দুই গ্লাস পানি খেলাম। পানি খাবার আগ পর্যন্ত বুঝতে পারিনি আমার পিপাসা লেগেছে। সিংকের পাশে বসে গ্যাস বার্নার থেকে সিগারেট ধরালাম। এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি, জ্যোৎস্নার আলোয় গলফ কোর্স ভেসে গেছে। ঝিঁঝি পোকা ডাকছে বিরামহীনভাবে। কেন যেন মনটা খুব উদাস হয়ে গেল।

পুরোনো সুইচ প্যানেলটা ছিল গ্যাস বার্নারের পাশে। এটা দিয়ে দুই বোন সারা দিন খেলেছে। সেটা হাতে তুলে নিলাম। উল্টেপাল্টে বোঝার চেষ্টা করলাম, সারা দিন কাটানোর মতো কী আছে এটার মধ্যে। কিছু খুঁজে পেলাম না। শুধুই একটা অর্থহীন ফাইবার বোর্ড। অনেক পুরোনো। সেটা আগের জায়গায় রেখে দিয়ে আবার সিগারেটে টান দিলাম। চাঁদের আলোয় সবকিছু ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, কোনো কিছুরই কোনো অর্থ বা উদ্দেশ্য নেই। সিগারেটটা সিংকে ঘষে নিভিয়ে আরেকটা ধরালাম।

এ জীবনে কি এমন কোনো জায়গা আমি খুঁজে পাব না, যেটা আমার নিজের বলে মনে হবে? একেবারে আমার একটা কিছু? যদি এ রকম কোনো জায়গা

থেকেই থাকে, তাহলে সেটা কোথায় আছে? আমি সেটা নিয়ে ভাবলাম। ভাবতে ভাবতে আমার সামনে একটা অর্থহীন ছবি ভেসে উঠল। আমি একটা দুই সিটের ছোট কামিকাজি টর্পেডো বিমানের ককপিটে নিজেকে দেখতে পেলাম। কিন্তু, এটা আমি কেন দেখব? আমি তো বিমান চালাতে জানি না। এটা কী করে আমার জায়গা হবে? তার চেয়েও বড় কথা, এই মডেলের বিমানগুলো ৩০ বছর আগে পৃথিবীর বুক থেকে হারিয়ে গেছে। এ রকম অর্থহীন একটা জিনিস কী করে আমার জায়গা হতে পারে বুঝে পেলাম না।

হাল ছেড়ে দিয়ে আবার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। দুই বোনের মাঝে গিয়ে শরীরটা রাখতেই তারা কুঁকড়ে খাটের কিনারের দিকে সরে গেল। কিন্তু তাদের ঘুম ভাঙল না। গভীর নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পেলাম। কম্বলটা গায়ে তুলে আমি উদাসভাবে ছাদের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

৬

মেয়েটা বাথরুমে ঢুকে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল। কিছুক্ষণ পর শাওয়ারের শব্দ শুনতে পেল র‍্যাট। নিজের অ্যাপার্টমেন্টের বিছানায় বসে সে ভাবতে শুরু করল।

চিন্তাভাবনাগুলো এলোমেলো লাগল নিজের কাছেই। সেগুলোকে গোছাতে সে প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করল। পকেট হাতড়ে লাইটার খুঁজে পেল না। টেবিলে দেখল, সেখানেও নেই। বিছানা থেকে নেমে এসে অন্ধকারের মধ্যেই এদিক-সেদিক খুঁজল। লাইটার তো দূরের কথা, একটা ম্যাচবাক্সও খুঁজে পেল না। কিন্তু তার সিগারেটের নেশা মাথায় উঠে ছিল। একপ্রকার বাধ্য হয়েই সে মেয়েটার হ্যান্ডব্যাগ হাতড়াল। সেখানেও নেই। এরপর আর বাতি না জ্বালালে চলে না। রুমের বাতিটা জ্বালিয়ে ড্রয়ার হাতড়াল। অবশেষে সে এক বাক্স দেশলাই খুঁজে পেল। বাক্সের গায়ে কোনো একটা রেস্টুরেন্টের নাম লেখা। সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সিগারেট ধরাল।

একটা বেতের সোফায় মেয়েটার অন্তর্বাসগুলো পড়ে আছে। সরিষা রঙের জামাটা এমনভাবে রাখা যেন ভাঁজ না পড়ে। পাশেই তার দামি হাতঘড়ি।

র‍্যাট উল্টোদিকের বেতের চেয়ারটাতে বসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল।

দূরের পাহাড়ে কিছু মানুষ ইতস্তত ঘোরাফেরা করছে। এই জানালা দিয়ে বাইরের পৃথিবী দেখা র‍্যাটের একধরনের খেলা। সে মাঝে মাঝে ঘন্টার পর ঘণ্টা বাইরে তাকিয়ে থাকে। একজন গলফার যেভাবে শট নেওয়ার আগে কোমরে হাত দিয়ে সামনের গলফ কোর্সকে মেপে নেয়, সেভাবে সে বাইরে তাকায়। পাহাড়ের ঢালটা কৌণিকভাবে নিচের দিকে নেমে গেছে। যেখানে গিয়ে সমতলের সঙ্গে মিশেছে, সেখানে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু বাড়িতে আলো জ্বলছে। আরেকটু দূরে ছোট ছোট কিছু পাহাড়, পাইন আর সিডারগাছ। দুই একটা সুইমিংপুল দেখা যায় তার জানালা থেকে। সেগুলোতে মার্কারি লাইট জ্বলছে। অনেক দূরে গিয়ে আকাশ যেন গভীর কোনো অন্ধকারে সমুদ্রে মিশে গেছে। সেই অন্ধকারের বুক চিরে মাঝেমধ্যে বাতিঘরের আলোটা দেখা যাচ্ছে। সেটা একবার জ্বলছে আবার হারিয়ে যাচ্ছে। তারপর আবার জ্বলে উঠছে।

র‍্যাটের সঙ্গে এই মেয়েটার পরিচয় হয়েছিল সেপ্টেম্বরের শুরুতে। গ্রীষ্ম তখন বিদায় নেওয়ার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত। কিন্তু কী কারণে যেন কয়েকটা দিন থেকে গিয়েছিল।

র‍্যাট তখন সিরিয়াসলি লেখালেখি করবে বলে ঠিক করেছে। সে জন্য তার একটা টাইপরাইটার দরকার ছিল। স্থানীয় পত্রিকার ক্রয়-বিক্রয় সেকশনে সে একদিন একটা বিজ্ঞাপন দেখে। একটা টাইপরাইটার বিক্রি হবে। নম্বর দেখে সে ফোন করল। যে মেয়েটা ফোন ধরল, তার কথাবার্তা একেবারে রসকষহীন। পুরোপুরি ব্যবসায়িক সুরে সে যন্ত্রের মতো বলে গেল, জিনিসটা এক বছর ধরে আমি ব্যবহার করছি। এখনো এক বছরের ওয়ারেন্টি বাকি আছে ... না কোনো ইনস্টলমেন্টে পেমেন্ট করা চলবে না। একবারে নগদ টাকায় কিনে নিতে হবে ... এবং তোমাকেই আসতে হবে জিনিসটা নেওয়ার জন্য। আমি পৌঁছে দিতে পারব না।

দামদস্তুর হয়ে যাওয়ার পর র‍্যাট গেল তার বাসায়। টাকাটা দিয়ে টাইপরাইটারটা নিয়ে নিল। সে পুরো গ্রীষ্মকাল পার্টটাইম জব করে যে টাকা জমিয়েছিল তার পুরোটাই বেরিয়ে গেল।

মেয়েটা সাইজে ছোটখাটো ধরনের। কিন্তু দেখতে বেশ ভালো। তার বয়স কত হতে পারে র‍্যাট তার কোনো আন্দাজ পেল না। সম্ভবত বাইশ থেকে আটাশের মধ্যে হবে। পোশাকে রুচির ছাপ বেশ স্পষ্ট। সেদিন সে

একটা স্লিভলেস ড্রেস পরেছিল, মিডনাইট ব্লু রঙের। অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকতে টবের মধ্যে অনেক ধরনের লতাপাতাওয়ালা গাছ। অ্যাপার্টমেন্টটা সুন্দরভাবে সাজানো। সেদিন বেশি কথা হলো না তাদের মধ্যে।

তিন দিন পর মেয়েটা আবারো ফোন দিল এবং বলল তার কাছে টাইপরাইটারের জন্য ছয়টা রিবন আছে। সেগুলো তার কোনো কাজে লাগবে না। র‍্যাট চাইলে সেগুলো এসে নিয়ে যেতে পারে। সে জন্য কোনো দাম দিতে হবে না।

সুতরাং র‍্যাট গিয়ে তার বাড়ি থেকে রিবনগুলো সংগ্রহ করল। মেয়েটা যেহেতু টাকা নেবে না, সে ড্রিঙ্ক অফার করল। তারা দুজন গিয়ে জে-র বারে বসল এবং ককটেল খেল। কিন্তু সে পর্যন্তই। সেবার তাদের ব্যাটে-বলে হলো না।

তার চার দিন পর তৃতীয়বারের মতো দেখা করল তারা। এবার একটা ইনডোর সুইমিংপুলে। একসঙ্গে সাঁতার কেটে র‍্যাট তাকে নিজের গাড়িতে করে অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে দিল। এবং রাতটা সেখানেই থেকে গেল। তাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, সে মেয়েটাকে নিয়ে কী করে বিছানায় গেল, সে বলতে পারবে না। সে মেয়েটাকে পটিয়েছিল নাকি মেয়েটা নিজেই তাকে এ ব্যাপারে গ্রিন সিগন্যাল দিয়েছে, র‍্যাটের পক্ষে সেটা নির্দিষ্ট করে বলা মুশকিল। সে শুধু জানত, অনিবার্য নিয়তির মতো ব্যাপারটা ঘটে গেছে।

কিছুদিনের মধ্যেই র‍্যাট আবিষ্কার করল, ধীরে ধীরে সম্পর্কটার ভেতর ডুবে যেতে শুরু করেছে সে। এবং তার মধ্যে একটু একটু করে অনেক কিছু পরিবর্তন হচ্ছে। সে পরিবর্তনের ছোঁয়া তার প্রতিদিনকার জীবনেও লেগেছিল। একটু একটু করে তার ভেতরের রুক্ষ ভাবটা কমতে শুরু করল। যেসব ভদ্রোচিত মিষ্টি ব্যাপার তার মধ্য থেকে হারিয়ে গিয়েছিল সেগুলো যেন একটু একটু করে ফিরে এল। সে আবিষ্কার করল, তার কল্পনার সবটুকু জায়গা ওই মেয়েটা দখল করে নিয়েছে। সে অন্য কিছু আর ভাবতে পারছে না। তাকে এক ভয়ংকর 'ভালো লাগা' রোগ পেয়ে বসল। হুট করেই সবকিছু ভালো লাগতে শুরু করল।

র‍্যাট মেয়েটার যে জিনিসটা সবচেয়ে পছন্দ করল তা হলো, নিজেকে প্রতিটা মুহূর্তে আরও শুদ্ধ, আরও পরিণত, আরও নিখুঁত করার চেষ্টা। অন্য কারও সঙ্গে নয়, নিজের সঙ্গেই নিজের এক রকমের প্রতিযোগিতা। সে সব সময়ই তার চারপাশের সবকিছু আর একটু বেশি সুন্দর, আরও নিখুঁত করতে চাইত। র‍্যাট জানত যে এটা মোটেই সহজ কাজ নয়। ব্যাপারটাতে প্রচণ্ড

ইচ্ছাশক্তি দরকার হয়। দামি জামাকাপড়ের ওপর তেমন কোনো লোভ ছিল না তার। তাই বলে রুচিহীন কোনো কিছু সে পরত না। ভদ্র আর মার্জিত যে পোশাক সে পরত, তাতে তার ক্লাস বোঝা যেত। তার ব্যবহার করা অন্তর্বাসগুলো কখনো ময়লা দেখেনি র‍্যাট। শরীর থেকে সব সময় দামি কোলনের গন্ধ আসত।

কথা বলার সময় প্রতিটা শব্দ আলাদা করে বাছাই করত। মনে হতো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্র্যাকটিস করা কথা। মুখের মিষ্টি হাসিটা দীর্ঘদিনের অভ্যাসে সে আয়ত্ত করেছে, বোঝা যায়। বোকা বোকা মেয়েরা যে রকম অর্থহীন প্রশ্ন করে, সে রকম কোনো প্রশ্ন সে কখনো করেনি। মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপারগুলোতে অযথা নাক গলানোর বদভ্যাস তার একেবারেই নেই। কয়েকবার দেখা করার পর র‍্যাট আন্দাজ করল, মেয়েটার বয়স সাতাশ হতে পারে। দেখা গেল তার ধারণা একেবারে ঠিক।

মেয়েটার স্তনগুলো ছোট ছোট, কিন্তু তাতে আকর্ষণ কমে যায়নি। শরীরে একেবারে মেদ নেই, চমৎকারভাবে রোদে পোড়া তামাটে গায়ের রং। গালের হাড় সামান্য উঁচু, ঠোঁটগুলো সরু। তবে সবকিছু ছাপিয়ে তার চেহারার মধ্যে সরলতাই সবার আগে চোখে পড়ে। পাশের বাড়ির মেয়েটার মতো মনে হয়। স্থাপত্যবিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা শেষ করেছে সে। কাজও করছে একটা আর্কিটেকচার ফার্মে। র‍্যাট একবার জানতে চেয়েছিল তার আসল বাড়ি কোথায়।

এদিকে কোথাও না, সে উত্তর দিয়েছিল, আমি এই এলাকায় এসেছি আমার গ্র্যাজুয়েশনের পরে।

মেয়েটা সপ্তাহে একদিন সাঁতার কাটতে যেত। নিয়ম করে একদিন র‍্যাটের সঙ্গে ডেট করত। সাধারণত তারা দুজনে মিলে শনিবার রাতটাকেই বেছে নিত। পরদিন রোববার। র‍্যাটের কোনো কাজ থাকত না, পুরো দিন কেটে যেত আগের রাতের আবেশে। আর সেই মেয়েটা ট্রেন ধরে অন্য আর একটা শহরে যেত ভায়োলিন শিখতে। নিজেকে নিখুঁত করার চেষ্টা রোববার বলে বাদ যেত না।

৭

কী করে যেন সর্দি-জ্বর বাঁধিয়ে বসলাম। অফিস কামাই গেল কয়েক দিন। তিন দিন পর অফিসে ফিরে দেখি, বাঁ দিকের ক্যাবিনেটে ছোটখাটো একটা পাহাড় জমে গেছে। মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল। সকালে শরীরের টেম্পারেচার কম দেখে অফিসে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। কিন্তু শরীর তখনো বেশ দুর্বল। মুখে কোনো স্বাদ নেই। কিছু মুখে দিলে মনে হয় টিস্যু-পেপার চিবুচ্ছি। একটা সিরিশ কাগজ দিয়ে শরীরের চামড়ায় ঘষাঘষি করলে যে রকম একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি হওয়ার কথা, ঠিক সে রকম একটা কিছু নিজের মধ্যে টের পাচ্ছি।

ক্যাবিনেটের কাছে গিয়ে দেখলাম সব ধরনের অনুবাদের কাজ জমে আছে। বইয়ের পাণ্ডুলিপি থেকে শুরু করে বুকলেট, ম্যাগাজিন। দুটো ম্যানুয়াল পর্যন্ত আছে। আমার বন্ধু ডেস্কের সামনে এসে জ্বর হলে কী কী করতে হবে বা না করতে হবে, কীভাবে শরীরের যত্ন নিতে হবে, এ-সংক্রান্ত নাতিদীর্ঘ এক বক্তব্য রেখে চলে গেল। সেই বক্তব্য বেশ উপদেশমূলক এবং একই সঙ্গে সহানুভূতিসূচক। সেক্রেটারি মেয়েটা প্রতিদিন সকালে যেভাবে কফি বানিয়ে টেবিলে রেখে যায়, সেভাবে রাখল। অসুস্থ বলে দুটো ভেজিটেবল রোল বোনাস পেলাম। সম্ভবত বাসা থেকে লাঞ্চের জন্য খাবে বলে বানিয়ে নিয়ে এসেছে সে। আমার যেহেতু জ্বর, ওগুলোর ন্যায্য দাবিদার হিসেবে আমি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে গেলাম।

আসার পথে সিগারেট কিনে আনতে ভুলে গিয়েছি। এখন আবার নিচে নেমে কিনে আনা যায়। কিন্তু শরীর টানছিল না। একপ্রকার বাধ্য হয়েই বন্ধুর রুম থেকে এক প্যাকেট সেভেন-স্টার সিগারেট ধার করলাম। সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তেই মাথাটা একটু একটু করে পরিষ্কার হতে শুরু করল। বাইরে আজ রোদের তেমন তেজ নেই। আকাশে বেশ মেঘ করেছে। সম্ভবত বৃষ্টি হবে। রুমের বাতাস সিগারেটের ধোঁয়ায় ভরে গেল। মনে হচ্ছে, কেউ ভেজা পাতা পোড়াচ্ছে। আমি এমনকি নাকে সেই গন্ধও টের পেলাম।

একটা গভীর নিশ্বাস ফেলে বাঁ পাশে জমা হওয়া ফাইলের স্তূপের দিকে তাকালাম। খুঁজে বের করার চেষ্টা করলাম কোনটা বেশি জরুরি। সাধারণত জরুরি ফাইলগুলোর ওপরে লাল কালিতে লেখা থাকে 'আর্জেন্ট'। সঙ্গে

ডেডলাইনটাও গোল করে দাগানো থাকে। সৌভাগ্যবশত একটামাত্র ফাইল পেলাম যেটায় আর্জেন্ট লেখা আছে। তার চেয়েও বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার বাকি ফাইলগুলোর ডেডলাইন বেশ খানিকটা দূরে। ধীরেসুস্থে কাজ করলেই চলবে। তাড়াহুড়ো নেই কোনো। পার্টটাইমারদের দিয়ে ফার্স্ট ড্রাফট করিয়ে নিতে পারলে সেগুলো যথাসময়ে শেষ হয়ে যাবে। কোনো অসুবিধা হবে না।

আমি ডেস্কের ওপর থেকে একটা একটা করে কম জরুরি ফাইলগুলো আবার বাঁ দিকের ক্যাবিনেটে তুলে রাখলাম। শেষ পর্যন্ত মোট চারটা ফাইল টেবিলে রয়ে গেল। আমি সেগুলোর নাম দেখলাম :

১) Charles Rankin, Scientific Puzzle Box : Animals
অধ্যায়ের নাম : Why Cats Wash Their Faces
এই অধ্যায়ের ৬৮ নম্বর পৃষ্ঠায় How Bears Catch Fish নামে একটা নিবন্ধ আছে।
সেই নিবন্ধের ৮৯ নম্বর পৃষ্ঠা পর্যন্ত করতে হবে।
শেষ করার তারিখ : ১২ অক্টোবর।

২) American Nursing Association, ed., Talking with the Terminally Ill.
১৬ পৃষ্ঠা। পুরোটাই করতে হবে।
শেষ করার তারিখ : ১৯ অক্টোবর।

৩) Frank de Seto, Jr., Tracing Authors' Illnesses.
অধ্যায় তিন : Authors and Hay Fever.
এই অধ্যায়ের পুরো ১৬ পৃষ্ঠাই করতে হবে।
শেষ করার তারিখ : ২৩ অক্টোবর।

৪) Rend Claire, Le Chapeau de Paille d'Italie,
মোট ৩৯ পৃষ্ঠা আছে। পুরোটাই করতে হবে।
শেষ করার তারিখ : ২৬ অক্টোবর।

মোটামুটি এই চারটা ফাইল অনুবাদ করলেই আপাতত কাজ চলে যাবে। ফাইলগুলোর ওপর ক্লায়েন্টের নাম লেখা নেই। বুঝতে পারলাম না, তারা

কী ধরনের অনুবাদ চাচ্ছে। পুরো ব্যাপারটা যথেষ্ট বিরক্তিকর ঠেকল আমার কাছে। অনুবাদ নানান ধরনের হয়ে থাকে। কেউ একদম আক্ষরিক অনুবাদ চায়। আবার কেউ ভাববাচ্যে কিছু একটা চায়, বিষয়টার ভেতরে ঢুকতে চায়। কারা এই অনুবাদের কাজ দিয়েছে, তাদের নাম দেখলে অনুবাদের ধরনটাও বুঝে ফেলা যায়। তখন ক্লায়েন্টকে খুশি করাটা ডালভাত। না হলে কাল্পনিক এক ক্লায়েন্টের জন্য কাজ করতে হয়। ধরে নিতে হয়, নদীর ধারে বসে থাকা একটা ভালুকের জন্য অনুবাদের কাজটুকু করছি।

কফিতে একটা চুমুক দিয়ে রোলে কামড় বসালাম। খেতে ঠিক প্লাস্টার অব প্যারিসের মতো লাগল। আর একটা সিগারেট ধরিয়ে মাথাটা পরিষ্কার করে নিলাম। জ্বরের কারণে শরীরের গিঁটে গিঁটে ব্যথা। ড্রয়ার খুলে ছুরি বের করলাম। একটা সুইস আর্মি নাইফ। শার্পনারের বদলে ছুরি দিয়ে পেনসিল চাঁছতেই আমার বেশি ভালো লাগে। ছয়টা এইচ-বি পেনসিলের মাথা একদম চোখা করে চাঁছলাম। কাজ শুরু হয়ে গেল।

স্টেরিওতে স্টান গেটজের একটা পুরোনো মিউজিক বাজছিল। আমার কাজের ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে বেশ মিলে গেল সেটা।

দুপুরের দিকে পাশের একটা রেস্টুরেন্টে খেতে গেলাম। আমার অফিস থেকে ঠিক পাঁচ মিনিটের হাঁটাপথ। অনেক ভিড়ের মধ্যে বসে কোনোরকমে মাছভাজা জাতীয় কিছু একটা খেয়ে নিলাম। দুনিয়ার সব লোক আজ বোধ হয় সেই রেস্টুরেন্টে খেতে এসেছে। এত লোক দেখে গা গুলিয়ে উঠল। সেখান থেকে বেরিয়ে একটা হ্যামবার্গার স্ট্যান্ডের সামনে থেকে অরেঞ্জ জুস কিনে খেলাম। কোনো কারণ ছাড়াই রাস্তা ধরে খানিকক্ষণ হাঁটলাম। দশ মিনিট হাঁটার পর একটা দোকান চোখে পড়ল। সেখানে কুকুর, বিড়াল, খরগোশ আর বিভিন্ন ধরনের পাখি বিক্রি করা হচ্ছে। দোকানটায় একটা আবিসিনিয়ান বিড়ালের সঙ্গে কিছুক্ষণ খেললাম। খাঁচার ভেতর দিয়ে আঙুল ঢুকিয়ে বিড়ালটাকে বেশ কয়েকবার খোঁচা মারলাম। একজন আদর্শ মধ্যবিত্ত কেরানির মতো করে লাঞ্চ ব্রেকের পুরো সময়টা বেশ কেটে গেল আমার।

অফিসে ফিরে এসে দুপুর একটা পর্যন্ত অলসভাবে সামনের খবরের কাগজটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। অনুবাদের কাজটা নতুন করে শুরু করার মতো মনের জোর খুঁজে পাচ্ছি না। ছুরি দিয়ে আরও ছয়টা পেনসিল শার্প করে ফেললাম। এরপর সেভেন স্টারের প্যাকেট থেকে সব কটি সিগারেট বের

করে আমার ডেস্কে পর পর সাজালাম। সেগুলোকে বারবার গুনে দেখলাম সংখ্যায় কোনো উনিশ-বিশ হচ্ছে কি না।

মেয়েটা অনেকক্ষণ ধরেই কিচেন থেকে আমার ডেস্কের দিকে উঁকিঝুঁকি মারছিল। অবশেষে সে এক কাপ গরম গ্রিন টি নিয়ে হাজির হলো।

কেমন লাগছে এখন? সে জানতে চাইল।

খারাপ না, আমি বললাম।

কাজ কেমন এগোচ্ছে?

ভালোই। এর চেয়ে ভালো এগোনো সম্ভব না।

বাইরের আকাশ তখনো মেঘে ঢাকা। জানালা দিয়ে একবার বাইরে মাথা বের করতেই মুখে বৃষ্টির ফোঁটা এসে পড়ল। আকাশে উড়ে গেল কিছু শরতের পাখি।

জানালা পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়ে স্টেরিওতে চার্লি পার্কারের 'জাস্ট ফ্রেন্ড' অ্যালবামটা দিলাম। এবার কাজ শুরু করতেই হলো। যে কাজটা করছিলাম তার শিরোনাম হলো 'অতিথি পাখিরা কখন ঘুমোতে যায়?' বিষয়বস্তু নিঃসন্দেহে অসাধারণ। অতিথি পাখিদের ঘুমানোর সময় নির্ণয় অবশ্যই জনস্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়।

চারটার দিকে কাজ শেষ হয়ে গেল। যেটুকু শেষ হলো, মেয়েটার হাতে তুলে দিয়ে বাইরে বের হলাম। ছাতা খোলার বদলে শরীরে পাতলা একটা রেইনকোট চাপালাম। রেইনকোটটা অফিসেই থাকে। বৃষ্টিবাদলার দিনে বেশ কাজে লেগে যায়। স্টেশনে গিয়ে সন্ধ্যার একটা কাগজ কিনলাম। পরবর্তী এক ঘণ্টা ভিড়ের ট্রেনে বসে কাগজে চোখ বোলালাম। মনে হচ্ছিল, বাইরে অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। সেই বৃষ্টির গন্ধ পর্যন্ত আমি টের পাচ্ছি। আসলে এক ফোঁটাও বৃষ্টি পড়েনি। খটখটে শুকনো ট্রেনে রেইনকোটটা খুলে হাতে নিয়ে নিলাম।

স্টেশনে নেমে কিছু বাজার-সদাই করার কথা মনে পড়ল। একটা সুপারমার্কেটে ঢুকে যখন কেনাকাটা করছি তখনই বৃষ্টি নামল। সরু ধারায় বৃষ্টি, প্রায় চোখেই দেখা যায় না। সুপারমার্কেটের গ্রাউন্ড ফ্লোরে একটা কফিশপ ছিল। সেখানে বসে কফি নিলাম এক কাপ। যে ওয়েট্রেস কফি নিয়ে এল, তার ব্লাউজ থেকে বৃষ্টির গন্ধ পাচ্ছিলাম। সত্যিকারের গন্ধ।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। বাসস্ট্যান্ডে বেশ ভিড়। বৃষ্টির মধ্যেও অফিসফেরত লোকগুলো যে যার বাড়িতে ফিরে যাচ্ছে। পাহাড়ি ঝরনায়

ট্রাউট মাছ যেভাবে স্বচ্ছন্দে সাঁতার কাটে, বাসগুলো যেন বৃষ্টির মধ্যে সেভাবে টার্মিনালে ঢুকছে। এক মধ্যবয়সী মহিলা একটা কালো জার্মান শেফার্ড কুকুর নিয়ে আমার জানালার ঠিক পাশ দিয়ে চলে গেল। একটু দূরে রাস্তার পাশে স্কুলফেরত একদল বাচ্চা একটা রবারের বল দিয়ে খেলছে। এসব দেখতে দেখতে আমি আমার পঞ্চম সিগারেটটা শেষ করলাম। কাপের বাকি কফিটুকু এক চুমুকে শেষ করে উঠে দাঁড়ালাম।

জানালার কাচে আমার প্রতিবিম্ব দেখে চমকে গেলাম। চোখগুলো জ্বরের কারণে একটু ঘোলা দেখাচ্ছে। সেটা কোনো সমস্যা না। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। বিকেল পাঁচটার আলোর মতো একটু কালচে। সেটাও কোনো সমস্যা না। যেটা সমস্যা তা হলো, আয়নায় যে মানুষটাকে দেখছিলাম, সে আমি নই। সেখানে একটা চব্বিশ বছরের ছেলে দাঁড়িয়ে আছে, আমি হয়তো জীবনে কখনো ট্রেনে তার পাশের সিটে বসেছিলাম। সম্পূর্ণ ভিন্ন আরেকজন মানুষ। আসলে ভিন্ন আরেকজন মানুষও নয় সে। যেকোনো একজন মানুষ। আমার নিজেকে পুরোপুরি বিশেষত্বহীন বলে মনে হলো। এ রকম চব্বিশ বছর বয়সী একটা ছেলেকে রাস্তায় সব সময়ই দেখা যায়। দেখা হলে কেউ একজন হয়তো তাকে 'হাই' বলবে। তখন সে বলবে 'হ্যালো'। তারপর দুজন যে যার গন্তব্যে চলে যাবে। কেউ কারও দিকে ফিরেও তাকাবে না।

চেহারায় বিশেষত্ব আনতে হলে কী করা যেতে পারে? কানের মধ্যে একটা গন্ধরাজ ফুল গুঁজে দিলে কেমন হয়? সাঁতার কাটার সময় সাঁতারুরা যে রকম ফ্লিপার টাইপের লম্বা গ্লাভস পরে, সে রকম কোনো গ্লাভসও পরা যেতে পারে। বেশ অন্য রকম দেখাবে আমাকে তখন। মানুষজন হাঁটতে হাঁটতে আমার দিকে দ্বিতীয়বার ফিরে তাকাতে বাধ্য হবে। কিন্তু তাতে কী এসে যায়? হয়তোবা তিন সেকেন্ডের জন্য একটু মনোযোগ পাওয়া যাবে। কিন্তু তারপর? তারপর সে আবার নিজের পথে হাঁটবে। আমিও সেই একই কাজ করব।

এই কথাগুলো কী কারণে আমার মনে হলো আমি জানি না। কিন্তু আমার ভেতরটা যেন একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল। মনে হলো এই পৃথিবীকে আমার দেওয়ার মতো কিছু নেই।

যমজ দুই বোন বাড়িতে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। বাজারের ব্যাগটা তাদের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে শাওয়ারে ঢুকলাম। সাবান ঘষার কোনো প্রয়োজন

বোধ করলাম না। এমনকি মুখ থেকে সিগারেটটাও ফেললাম না। সেভাবেই অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম পানির নিচে। মাঝখানে একবার বাতি নিভে গেল। তাতে আমার কোনো অসুবিধা হলো না। আমি সবকিছু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। যা দেখা যায় এবং যা দেখা যায় না—সবকিছু আমার চোখের সামনে এসে দাঁড়াল।

দেয়ালের মধ্যে আমি এমন কিছু দেখতে পেলাম যা আলো থাকলে হয়তো দেখতে পেতাম না। একটা ছায়া দেখলাম, আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। কিসের ছায়া জানি না। ছুঁতে চাইলাম, পারলাম না।

শাওয়ার থেকে বেরিয়ে তোয়ালে দিয়ে ভালো করে গা মুছে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। নীল রঙের চাদরটা সকালে দেখিনি। নতুন বিছানো হয়েছে। সেখানে শুয়ে ছাদের দিকে তাকিয়ে পরপর দুটো সিগারেট শেষ করলাম। এর মধ্যেই যমজ বোনেরা রান্নাবান্নার জন্য মোটামুটি সব আয়োজন শেষ করে ফেলেছে। ভাত রান্না শেষ, সবজি কেটে চুলায় চাপানো হয়ে গেছে, মাংস গ্রিল করাও শেষ।

বিয়ার খাবে? তাদের একজন জিজ্ঞেস করল।

খেতে পারি, বললাম আমি।

২০৮ ফ্রিজ থেকে একটা বিয়ার এনে আমার পাশে বসল। গ্লাসে ঢেলে দিল।

মনটা খারাপ? সে বলল।

একটু।

গান শুনবে? ২০৯ বলল।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, শোনা যেতে পারে।

সে উঠে গিয়ে রেকর্ডের শেলফের কাছে দাঁড়াল। হ্যান্ডেলের 'রেকর্ডার সোনাটা' বাজাল। এই রেকর্ডটা আমাকে আমার গার্লফ্রেন্ড নাওকো উপহার দিয়েছিল। কয়েক বছর আগের কথা। ভ্যালেন্টাইনস ডেতে সে আমাকে এটা দেয়। রেকর্ডটা শুনতে শুনতে অনেক আদর করেছিলাম তাকে। আমার স্পষ্ট মনে আছে। এরপর যখনই তাকে আদর করেছি, কেন যেন এই রেকর্ডটা পেছনে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের মতো বেজে গেছে।

বাইরে তখনো বৃষ্টি পড়ছিল। নীরবে আমরা তিনজন খাওয়া সেরে নিলাম। সাধারণত রাতে খেতে আমরা প্রচুর গল্প করি। সেদিন কোনো কথা হলো না। মিউজিক বেশ আগে থেমে গেছে। বৃষ্টি আর খাবার চিবোনোর শব্দ ছাড়া

পৃথিবীতে অন্য কোনো শব্দ নেই। খাওয়ার পর তারা দুজন খুব দ্রুত টেবিল পরিষ্কার করে ফেলল। রান্নাঘরে গিয়ে কফি বানিয়ে আনল। আমরা তিনজন একসঙ্গে বসে কফি খেলাম। কফি থেকে এত সুন্দর একটা গন্ধ আসছিল যে মনে হলো ওটার বোধ হয় জীবন আছে। তাই এ রকম নিজস্ব গন্ধ ছড়াচ্ছে।

২০৮ উঠে গিয়ে রেকর্ডারে বিটলসের 'রবার সোল' বাজিয়ে দিল।

এটা আমি কবে কিনলাম? নিজেই অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম।

তুমি কেনোনি। এটা আমরা কিনেছি, ২০৯ বলল।

তার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ২০৮ বলল, তুমি প্রতি সপ্তাহে আমাদের যে টাকা দাও, তার থেকে একটু একটু করে কিছু টাকা আমরা জমিয়েছিলাম। সেটা দিয়ে কিনেছি।

আমি গভীর বিস্ময়ে মাথা নাড়লাম। বললাম, এটা কেন কিনতে গেলে? তোমরা তো বিটলস পছন্দ করো না।

কথাটা বলেই আমি জিভে কামড় দিলাম। বুঝতে পারলাম, তারা দুজন আমার জন্য কিনে এনেছে এটা। তাদের তরফ থেকে আমার জন্য একধরনের উপহার। তাদের দেখে মনে হলো, আমার কথা শুনে তারা বেশ কষ্ট পেয়েছে।

আমরা ভেবেছিলাম এটা পেলে তুমি খুশি হবে, ২০৯ বলল।

আমরা খুবই স্যরি, ২০৮ বলল।

তারা দুজন একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল। টার্নটেবল থেকে রেকর্ডটা তুলে ধুলো মুছে জ্যাকেটের মধ্যে ভরে রাখল। এরপর আমরা তিনজন দীর্ঘক্ষণ কোনো কথা না বলে চুপচাপ বসে রইলাম।

একটা সময় আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, আমি আসলে সে রকম কিছু ভেবে কথাটা বলিনি। প্লিজ তোমরা কষ্ট পেয়ো না। আমি ক্ষমা চাচ্ছি। আসলেই স্যরি। খুব ক্লান্ত লাগছে আমার। মনটাও বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। প্লিজ রেকর্ডটা আবার চালাও। আমার খুব শুনতে ইচ্ছে করছে।

তারা দুজন একে অপরের দিকে তাকাল এবং মুখে হাসি ফুটে উঠল।

তোমাকে ভদ্রতা করে কিছু করতে হবে না। এটা তো তোমার বাসা, তাই না? তোমার যা ইচ্ছা তাই করবে, ২০৮ বলল।

আমরা কী মনে করলাম বা করলাম না, সেটা নিয়ে তুমি ভাবতে যেয়ো না, ২০৯ বলল।

প্লিজ, তোমরা থামবে? রেকর্ডটা চালাও, আমি প্রায় অনুনয় করলাম।

আমরা কফি খেতে খেতে 'রবার সোল'-এর দুটো সাইডই শুনলাম। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, আমি ডুবে যাচ্ছি। জ্বরটা ফিরে আসছে। তারা থার্মোমিটার দিয়ে আমার টেম্পারেচার দেখল। সেখানে ৯৯.৫ দেখাচ্ছে, সকালের থেকে ১ ডিগ্রি বেশি। মাথাটা বেশ ভার লাগছিল।

তোমার শাওয়ার নেওয়া উচিত হয়নি, ২০৮ বলল।

তুমি বিছানায় যাও, ঘুমানোর চেষ্টা করো, ২০৯ সুর মেলাল।

তর্ক না করে সিগারেটের প্যাকেটটা নিয়ে বিছানায় গেলাম। বালিশের নিচ থেকে *ক্রিটিক অব পিওর রিজন* বইটা বের করে চোখের সামনে মেলে ধরলাম। পড়ার চেষ্টা করলাম। কম্বলটাকে সূর্যের আলোর মতো উষ্ণ মনে হলো। বইটা পড়তেও খারাপ লাগছিল না। কিন্তু সিগারেটে টান দিয়ে বুঝতে পারলাম, জ্বর আরও বেড়ে গেছে। সিগারেটে কোনো স্বাদ পেলাম না। মনে হলো, বাসি নিউজপেপারে আগুন ধরিয়ে সেটার ধোঁয়া নিচ্ছি। বইটা বন্ধ করে চোখ বুজলাম। গভীর অন্ধকার এসে আমাকে গ্রাস করে নিল।

৮

কবরস্থানটা পাহাড়ের একদম চূড়ায়, আপাতসমতল একটা জায়গায়। দুপাশের কবরের মধ্য দিয়ে পায়ে হাঁটা পথটা এঁকেবেঁকে গেছে। দক্ষিণ দিকে একটা পাইনবন। র‍্যাট সেখানে তার গাড়িটা পার্ক করল। সিটে হেলান দিয়ে মেয়েটাকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে ওপর থেকে শহরটার দিকে তাকাল। একটু পরে অন্ধকার নামবে। রাতের বেলায় এখান থেকে নিচের দিকে তাকালে মনে হয়, পুরো শহরে সোনালি আলো জ্বলছে। একটা দানবাকৃতির পোকা যেন সোনালি ধুলো ছিটিয়ে দিয়েছে এলাকাজুড়ে।

মেয়েটা চোখ বন্ধ করে র‍্যাটের কাঁধে মাথাটা হেলান দিয়ে ছিল, যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। সেটা এক অদ্ভুত অনুভূতি। এক নারী তার কাঁধে মাথা রেখে শুয়ে আছে, এটা বুঝতে পেরে র‍্যাটের মনটা ভরে গেল। একটা গোটা জীবনের স্বপ্ন সে চোখের সামনে দেখে ফেলল। একজনকে ভালোবাসা, তার সঙ্গে ঘর করা, একসঙ্গে দুজনে মিলে ছোট ছোট বাচ্চা বড় করে তোলা, তারপর একদিন

বুড়ো হয়ে মরে যাওয়া ...। ভাবনাটা তাকে একেবারে উদাস করে দিল।

সে অন্য হাতটা দিয়ে পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাল। সমুদ্র থেকে আসা বাতাসে পাইনগাছের পাতা কাঁপছিল। তার একবার মনে হলো, মেয়েটা বোধ হয় সত্যিই ঘুমিয়ে গেছে। র‍্যাট আঙুল দিয়ে তার ঠোঁটটা একবার স্পর্শ করল। হাতের আঙুলে তার ভেজা নিশ্বাস টের পেল।

কবরস্থানটাকে একটা পরিত্যক্ত শহরের মতো দেখাচ্ছিল। অর্ধেকটা জুড়ে কবর, বাকি অর্ধেক পুরোপুরি খালি। সেই বাকি অর্ধেকে যাদের কবর থাকার কথা, তারা বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে। মাঝে মাঝে রোববারে পরিবারের সঙ্গে তারা বেড়াতে আসে। আর এসে তাদের ভবিষ্যতের ঠিকানাটা দেখে যায়। বেড়ানোর জন্য জায়গাটা আসলেই চমৎকার। কী ফুল নেই সেখানে! পাহাড়ের ওপরে বিশুদ্ধ বাতাস। নিচে চোখজুড়ানো দৃশ্য। পুরো জায়গাটা ঘুরে দেখে তাদের বড় শান্তি লাগে। তারা তখন আরাম করে গাছের নিচে একটা বেঞ্চে গিয়ে বসে। লাঞ্চ বক্স খুলে পুরো পরিবারের সঙ্গে একসঙ্গে লাঞ্চ খায়। দিন শেষে আবার তাদের ব্যস্ত জীবনে ফিরে যায়। আর মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করে।

কবরস্থানে একজন কেয়ারটেকার আছে। প্রতিদিন ভোরে সে নিচের শহর থেকে আসে। পায়ে হাঁটা পথগুলো পরিষ্কার করে। ঝরা পাতা কুড়িয়ে ময়লার ঝুড়িতে ফেলে দেয়। কবরস্থানে পরিবারের সঙ্গে আসা ছোট ছোট বাচ্চাকে সে দেখে রাখে। সেখানে একটা পুকুর আছে। বাচ্চাগুলো যেন খেলতে গিয়ে পুকুরে পড়ে না যায়, সেটা দেখাও সে তার দায়িত্ব বলে মনে করে। আরও একটা কাজ সে খুব যত্ন নিয়ে করে। তা হলো, প্রতিদিন তিনবার করবস্থানের স্পিকারে স্টিফেন ফস্টারের 'ওল্ড ব্ল্যাক জয়ি' বাজায়। একদম নিয়ম করে সকাল নয়টায়, বারোটায় এবং সন্ধে ছয়টায় গানটা বেজে ওঠে। কিন্তু এই গানটাই কেন বাজায়? র‍্যাট এটা নিয়ে যতবার ভাবে, ততবার অবাক হয়। ঠিক সাড়ে ছয়টার সময় কেয়ারটেকার কবরস্থান ছেড়ে নিচের ধুলোর পৃথিবীতে নেমে যায় আবার। জায়গাটা খালি পড়ে থাকে।

সেই খালি জায়গাটার সুযোগ নিতে সেখানে একের পর এক গাড়ি আসতে শুরু করে। প্রতিটা গাড়িতে এক জোড়া ছেলেমেয়ে। পাহাড়ের নির্জনতায় তারা একজন আরেকজনের মধ্যে হারিয়ে যায়। আদর করতে শুরু করে। গ্রীষ্মের সময় পাইনবনের ধারে গাড়ির ছোটখাটো একটা মেলা বসে যায় যেন।

র‍্যাট এখানে যখন প্রথম আসে, তখন সে অনেক ছোট। তখনো গাড়ি চালানোর লাইসেন্স পায়নি। তার একটা ২৫০ সিসি মোটরবাইক ছিল। সেই বাইকের পেছনের সিটে প্রতিবার একটা করে নতুন মেয়েকে বসিয়ে সে জায়গাটায় আসত। সেই মেয়েদের বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে নিচের শহরের দিকে তাকাত। যাদের জড়িয়ে ধরত, তাদের মোটামুটি সবাইকে নিয়েই তার মনে অনেক স্বপ্ন জাগত। স্বপ্ন দেখার অসুখ তার ছোটবেলা থেকেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্বপ্নগুলো বদলে যেত।

আপনি যদি দেখতে চান, তবে দেখতে পাবেন যে 'মৃত্যু' নামে একটা শব্দ কোমলভাবে পুরো জায়গাটায় ছড়িয়ে আছে। র‍্যাট যখন ওই মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে কবরস্থানের ভেতরের রাস্তা ধরে হাঁটত, সে মৃত্যুকে চোখের সামনে দেখতে পেত। মরে যাওয়া সব লোকের নাম পাথরে লেখা আছে। কী অদ্ভুত! লোকগুলো একটা সময় বেঁচে ছিল। কবরগুলো যেন সেটার সাক্ষ্য দিয়ে যাচ্ছে। তবে একটা ব্যাপার ঠিক। কবরস্থানের বাতাসে মৃতদের জন্য কোনো আফসোসের সুর বাজে না। কোনো ফুল তাদের জন্য ফোটে না। তারা এক চিরঅন্ধকার জগতে ডুবে থাকে। রক্তমাংসের মানুষগুলো যখন কবরগুলোর মধ্যে দিয়ে পায়ে চলা রাস্তায় হেঁটে যায়, তখন হয়তো কবরে শুয়ে থাকা মানুষদের অনেক কথা বলতে ইচ্ছে করে তাদের সঙ্গে। কিন্তু তারা বলতে পারে না।

র‍্যাট প্রতিবারই এই কবরগুলোর ভেতর দিয়ে হাঁটে। পুরো বিষয়টাকে অনুভব করার চেষ্টা করে। তারপর সঙ্গের মেয়েটাকে নিয়ে কবরস্থান থেকে বাইরে বেরিয়ে পাইনবনের কাছে যায় এবং তাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে। তার মন গভীর বিষাদে কেঁদে ওঠে। তাকে দেখে মনে হয়, সে এক দুঃখের সাগরে ডুবে আছে। সমুদ্র থেকে আসা বাতাসে বুকভরে শ্বাস নেয় সে। সেই বাতাসেও এক গভীর বেদনা টের পায়। বাতাসে পাইন পাতা কেঁপে ওঠে, যেন গান গায়। সেই গান বা ঝিঁঝি পোকার বিরামহীন ডাকে তার বুকটা হু হু করে ওঠে।

র‍্যাটের কাঁধে মাথা রেখেই মেয়েটা চোখ মেলে তাকাল।

আমি কি অনেকক্ষণ ধরে ঘুমালাম? মেয়েটা চোখ কচলে জানতে চাইল।

না, র‍্যাট বলল, খুব একটা বেশি না।

৯

প্রতিটা দিনই কি একটা আরেকটার কার্বন কপি? আমার অন্তত তাই মনে হয়। জীবনটা যেন একটা খোলা বই। প্রতিটা পৃষ্ঠা একই রকম। কোন পৃষ্ঠায় আছি, সেটা মনে রাখার জন্য বুকমার্ক দিয়ে রাখতে হবে।

যে দিনটার কথা বলছি, সেটার গায়ে শরতের গন্ধ লেগে ছিল। অফিসের কাজ প্রতিদিন যে সময়ে শেষ হয়, ঠিক সে সময়েই শেষ করে আমি অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এলাম। যমজ দুই বোনকে কোথাও খুঁজে পেলাম না। ধপ করে বিছানায় বসে পড়লাম। একটা সিগারেট ধরালাম। অনেক কিছুই আমার মনের মধ্যে পরপর আসতে লাগল। কিন্তু সেই ভাবনাগুলো কোনো পরিপূর্ণ আকার পেল না। দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমি বিছানার উল্টো দিকে সাদা দেয়ালের দিকে তাকালাম। সেখানে যেন আমার চোখ আটকে গেল। নিজেকে বললাম, কাম অন, তুমি চিরদিন ওই দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারবে না। সেখান থেকে চোখ ফেরাও।

কিন্তু তাতে কাজ হলো না। আমি তাকিয়েই রইলাম। যে প্রফেসর আমার গ্র্যাজুয়েশন থিসিসের দায়িত্বে ছিলেন, তিনি আমার থিসিসটা দেখে বলেছিলেন, খুবই সুন্দর স্টাইল। তোমার যুক্তিগুলো অসাধারণ। যেটা বলতে চাইছ, সেটা খুব পরিষ্কারভাবে বলতে পেরেছ। কিন্তু সমস্যাটা হলো, তুমি কিছুই বলতে চাওনি।

এটাই বোধ হয় আমার সমস্যা। আমি কখনো কিছু বলতে চাই না। কোনো কিছু কী করে বলতে হয়, তা আমি জানি না। এই যে একা বসে আছি এখন, আমি জানি না আমাকে কী করতে হবে।

আমার নিজের কাছে নিজেকেই বেশ উদ্ভট বলে মনে হয়। চার বছর ধরে আমি একটু একটু করে সবকিছু গুছিয়ে ফেলেছিলাম এবং মনে করেছিলাম, সবকিছু ভালোই তো চলছে। যদিও আমি জানতাম না, এই চারটা বছর আমি কী গোছালাম বা কী করে পার করলাম। আমাকে যদি বলতে বলা হয়, আমি পরিষ্কারভাবে কিছুই বলতে পারব না। শুধু গত চারটা বছর কেন, আমার এই চব্বিশ বছরের জীবনের কোনো কিছু সম্পর্কেই আমার পরিষ্কার কোনো ধারণা নেই।

মাঝে মাঝে কোনো একটা কাজ শুরু করার ঠিক মাঝখানে গিয়ে আমি ভুলে যাই আমি আসলে কী কাজ করছি। কাজটা করার উদ্দেশ্যই-বা কী? আমি

আসলে কিছু একটা জিনিস খুঁজে ফিরি। কী খুঁজি আমি? ওয়াইন ওপেনার, পুরোনো কোনো চিঠি, ক্যাশ মেমো, বাজারের রসিদ নাকি কান চুলকানোর মতো কোনো কিছু?

আমি হাল ছেড়ে দিয়ে বালিশের নিচ থেকে *ক্রিটিকস অব পিওর রিজন* টেনে নিলাম। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বইটা খুলতেই ভেতর থেকে একটা কাগজ বের হলো। সেখানে একটা ছোট্ট নোট লেখা, গলফ ক্লাবে চলে এসো।

স্বস্তির একটা নিশ্বাস ফেললাম। তাহলে তারা চলে যায়নি। একই সঙ্গে মনের মধ্যে একটু অস্বস্তি টের পেলাম। গলফ ক্লাবে তাদের একা যেতে নিষেধ করেছিলাম আমি। সন্ধ্যার দিকে জায়গাটা মোটেই নিরাপদ নয়, পৃথিবী সম্পর্কে খুব কম জানে এ রকম মেয়েদের জন্য তো খুবই বিপজ্জনক। তা ছাড়া বল উড়ে এসে গায়ে পড়তে পারে। অল্প আলোতে টের পাওয়া যাবে না।

আমি টেনিস শু পায়ে গলিয়ে একটা সোয়েট শার্ট পরে নিলাম। গলফ কোর্সের দেয়ালটা ডিঙিয়ে ১২ নম্বর হোল পার হলাম। সূর্যটা ডুবে যাচ্ছিল। গাছের ফাঁক দিয়ে সেই আলো এসে আমাকে ভিজিয়ে দিল। ১০ নম্বর হোলের কাছে গিয়ে দেখলাম, সেখানে ক্রিম বিস্কুটের একটা খালি প্যাকেট পড়ে আছে, কফি ফ্লেভারের। যমজ দুই বোন নিশ্চয়ই এটা বাসা থেকে নিয়ে এসেছে। আমি প্যাকেটটা একটা বলের মতো করে পেঁচিয়ে পকেটে পুরলাম। ঝরনার ওপরের ছোট কাঠের সেতুটা পেরিয়ে গিয়ে পাহাড় চড়তে শুরু করলাম। চূড়ায় উঠে দেখি অন্য পাশের ঢালে ওরা দুজন বসে আছে। ব্যাকগ্যামন গেম খেলছে।

তোমরা একা কেন এলে, আমি বললাম, তোমাদের আমি একা আসতে নিষেধ করেছি না?

বাড়িতে বসে থাকতে একেবারেই ভালো লাগছিল না। মনে হলো এখানে এসে একটু বসি। এখানে বসে সূর্য ডোবা দেখতে খুব ভালো লাগছে, ওদের একজন বলল।

আমি গিয়ে ওদের পাশে বসলাম। আসলেই সে ঠিক বলেছে। সূর্যাস্তটা সত্যিই অসাধারণ।

তোমরা যে বিস্কুটের প্যাকেটটা ফেলে এলে, এটা কি ঠিক করেছ? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

দুজনেই একসঙ্গে বলল, আমরা খুবই স্যরি। আসলেই ওটা করা আমাদের উচিত হয়নি।

খেলার মাঠে কোনো কিছু ফেলে রাখতে নেই। ছোটবেলায় আমি এ রকম আঘাত পেয়েছিলাম, বলে আমার বাঁ হাতের তর্জনীটা তাদের দেখালাম। সেখানে একটা কাটা দাগ।

ওরা চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল দাগটার দিকে।

কেউ একজন মাঠের মধ্যে সোডার বোতল ফেলে রেখেছিল, আমি বললাম, সেটা দেখতে পাইনি। পায়ে লেগে পড়ে যাই তখন।

তারা দুজনেই মাথা নাড়ল। দেখে মনে হলো পুরো বিষয়টাতে তারা খুবই লজ্জিত।

যদিও একটা বিস্কুটের প্যাকেটে কারও হাত-পা কিছু কাটবে না, বললাম আমি, তার পরও কোনো কিছু যেখানে-সেখানে ফেলা উচিত নয়। আজ বিস্কুটের প্যাকেট ফেলেছ, কাল হয়তো আরও বড় কিছু ফেলবে। তখন একটা ঝামেলা হবে। তা ছাড়া এই জায়গাটা অনেক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। এটাকে ময়লা করা ঠিক না।

আমরা বুঝতে পেরেছি, ২০৮ বলল।

এখন থেকে জিনিসটা খেয়াল রাখব, ২০৯ বলল, তোমার কি শরীরে আর কোথাও এ রকম কাটা দাগ আছে?

অবশ্যই আছে, বলে আমি তাদের আমার শরীরের বিভিন্ন জায়গার কাটা দাগগুলো দেখাতে শুরু করলাম।

আমার পুরো শরীরটা যেন বিভিন্ন প্রকার ছোট-বড় ক্ষতচিহ্নের একধরনের ক্যাটালগ। একবার চোখের মধ্যে ফুটবল এসে লেগেছিল। বাঁ চোখের রেটিনায় বেশ সমস্যা হয় তখন। সে সমস্যা এখনো কিছুটা আছে। ফুটবল খেলতে গিয়ে আরেকবার নাকে ব্যথা পেয়েছিলাম। আমি যখন বলটা হেড করতে যাব, প্রতিপক্ষ দলের একজনের দাঁত আমার নাকের ঠিক নিচে বসে যায়। রক্ত জমাট বেঁধে কালো দাগ হয়ে গিয়েছিল। ভালো করে দেখলে বোঝা যায়, সে জায়গাটা এখনো একটু কালো। সাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে একবার ঠোঁট কেটে যায়। সাতটা সেলাই পড়েছিল ঠোঁটে। একটা দাঁতের অর্ধেকটা ভেঙে যায়।

সূর্য পুরোপুরি ডুবে গেলে অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এলাম ডিনারের জন্য। এর মধ্যেই শাওয়ার সেরে নিয়েছি। একটা বিয়ার হাতে নিয়ে বসার কিছুক্ষণের মধ্যেই মেয়ে দুটো তিনটা ট্রাউট মাছ গ্রিল করে ফেলল। আমাদের প্রত্যেকের ভাগে একটা করে পড়ল। সঙ্গে অ্যাসপারাগাস আর কলমি শাক। খাওয়াদাওয়া

শেষে আমরা দ্রুত প্লেট গ্লাস ধুয়ে ফেললাম। দুই বোন গিয়ে কফি বানিয়ে আনল।

তোমরা যদি কিছু মনে না করো, আমি বললাম, আমি সুইচ প্যানেলটা নিয়ে একটু কথা বলতে চাই।

তারা দুজনেই মাথা নাড়ল।

জিনিসটার জন্য আমার মন খারাপ হয়ে আছে, বললাম আমি, তোমরা যে সেদিন বললে সেটা মরে যাচ্ছে, কেন বললে?

সম্ভবত জিনিসটার ওপর অনেক বেশি লোড পড়ে গিয়েছিল, ২০৯ বলল।

সেই লোডটা সে নিতে পারিনি, এ কারণেই মরে যাচ্ছে, ২০৮ সুর মেলাল।

তাহলে আমাদের কি কিছু করা উচিত সুইচ প্যানেলটার জন্য?

তারা দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে একসঙ্গে বলল, এখন আর কিছু করা যাবে না। অনেক দেরি হয়ে গেছে।

আমি চুপ করে রইলাম।

ওটা মরে যাবে, অনেক ধীরে ধীরে সময় নিয়ে মরবে, ২০৯ বলল।

তুমি কি কখনো কোনো বিড়ালকে বিষাক্ত কোনো খাবার খেয়ে মরে যেতে দেখেছ? ২০৮ জানতে চাইল।

না।

শুরুতে বিড়ালটার লেজ এবং থাবাগুলো পাথরের মতো শক্ত হয়ে যায়। তারপর খুব ধীরে ধীরে সেটা মরে যেতে শুরু করে। অনেক সময় নিয়ে কষ্ট পেয়ে মরে।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, কিন্তু সুইচ প্যানেলটা মরে যাবে, এটা আমি চাই না। ভাবতেই আমার খুব খারাপ লাগছে।

আমরা বুঝতে পারছি, তোমার কেমন লাগছে। মন খারাপ কোরো না।

তাদের কথার সুরে আবেগের লেশমাত্র ছিল না। তারা এমনভাবে বোঝাচ্ছিল, মনে হলো আমাকে বলছে, এ বছর তেমন বরফ পড়েনি। সুতরাং তুমি বরফে স্কিইং করতে পারবে না।

আমি সুইচ প্যানেলের কথা ভুলে গিয়ে কফিতে চুমুক দিলাম।

১০

বুধবার একটু আগেই বিছানায় গেল র‍্যাট। মোটামুটি নয়টার দিকে শুয়ে পড়ল। তার যখন ঘুম ভেঙে গেল, তখন ঘড়িতে এগারোটা বাজে। এরপর আর কিছুতেই ঘুম এল না। মনে হলো, কিছু একটা তার মাথাটাকে একদম চেপে ধরেছে। দুই সাইজ ছোট কোনো হ্যাট মাথায় চাপালে যে রকম চাপ লাগার কথা, মাথায় সে রকম একটা যন্ত্রণা টের পাচ্ছিল।

ঘুমানোর চেষ্টা বাদ দিয়ে সে রান্নাঘরে গেল। ফ্রিজ থেকে বের করে বরফের মতো ঠান্ডা পানি খেল। মাথাজুড়ে মেয়েটার কথা ঘুরপাক খাচ্ছিল। সে পানির গ্লাসটা হাতে করে জানালায় গিয়ে দাঁড়াল এবং দূরের বাতিঘরের দিকে তাকিয়ে রইল। ওই দূরে সমুদ্রসৈকতের পাশেই কোনো একটা অ্যাপার্টমেন্টে থাকে মেয়েটা। সেখান থেকে রাতের সমুদ্র দেখা যায়। সৈকতের ধুলো বাতাসে উড়ে এসে তার জানালায় বাড়ি খায়। র‍্যাট কল্পনায় সেই ধুলোর শব্দ শোনার চেষ্টা করল।

তার নিজের ওপর খুব বিরক্ত লাগছিল। সব সময় এমন হয়। সে যখন মনে করে সবকিছু মোটামুটি গুছিয়ে এনেছে, তখনই সব এলোমেলো হতে শুরু করে। তার জীবনটা কেন এ রকম এলোমেলো হয়ে যায়? কোনো কিছু ঠিকভাবে শেষ হয় না কেন? এমন না যে সে চেষ্টা করে না। কিন্তু সে যতই চেষ্টা করুক, তার জীবনটা এলোমেলো হবে, এটাই বোধ হয় তার নিয়তি।

যেদিন সে মেয়েটার সঙ্গে ডেট করতে শুরু করেছে, সেদিন থেকেই তার জীবনটা যেন একটা নির্দিষ্ট বৃত্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। প্রতিটা সপ্তাহ যেন ঠিক আগের সপ্তাহের ফটোকপি। সময়সংক্রান্ত জ্ঞান সে মোটামুটি হারিয়ে ফেলেছে। তাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, আজ কত তারিখ, কোন মাস—সে বলবে, 'সম্ভবত অক্টোবর।' কিন্তু তারিখটা নির্দিষ্ট করে বলতে পারবে না।

প্রতি শনিবার মেয়েটার সঙ্গে তার দেখা হয়। রোববার থেকে মঙ্গলবার তিন দিন কেটে যায় শনিবারের স্মৃতি রোমন্থন করে। গরু যেভাবে জাবর কাটে, সেভাবে করে স্মৃতিগুলোকে সে মনের মধ্যে জাগায়। বৃহস্পতি, শুক্র এবং এমনকি শনিবার দিনটার অর্ধেক তার কেটে যায় পরবর্তী ডেটে যাওয়ার প্রস্তুতি হিসেবে। এই তিন দিন সে বসে বসে ভাবে, পরেরবার মেয়েটার সঙ্গে দেখা

হলে কী কী করবে। শুধু বুধবারের দিনটা ফাঁকা থেকে যায়। এদিন সে কিছু করে না। একধরনের শূন্যতার অনুভূতি পেয়ে বসে তাকে। আসলে এই দিনটা সম্ভবত মহাশূন্যের বুকে কোনো একটা জায়গায় হারিয়ে যায়। বুধবার ...!

দশ মিনিট জানালায় দাঁড়িয়ে রইল র‍্যাট। এই সময়ের মধ্যে সে একটা সিগারেট শেষ করল। তারপর বাসার পাজামা ছেড়ে জিনস আর একটা শার্ট পরে নিল। তার ওপর একটা উইন্ডব্রেকার চাপিয়ে সোজা বাড়ির গ্যারেজে গিয়ে ঢুকল। গাড়ি বের করে রাস্তায় নামল।

মাঝরাত প্রায় পার হয়ে গেছে। শহরটা তখন মোটামুটি মরুভূমির মতো। কোথাও কোনো লোকজন নেই। দু-একটা স্ট্রিট ল্যাম্প বাদে রাস্তায় কোনো আলো নেই। জে-র বার ততক্ষণে বন্ধ হয়ে গেছে। কাস্টমার না থাকলেও ভেতরে জে-কে থাকতে হয় অনেকক্ষণ। কাজ গোছাতে গোছাতে তার প্রায়ই আরও ঘণ্টাখানেক লেগে যায়। র‍্যাট গিয়ে দেখল শাটারে তখনো তালা পড়েনি। সে শাটারটা টেনে তুলল। জে ধুয়ে রাখা তোয়ালেগুলো শুকানোর জন্য চেয়ারের ওপর বিছিয়ে দিচ্ছিল।

র‍্যাট তাকে একটা সিগারেট বের করে দিয়ে বলল, আমি যদি এখন একটা বিয়ার খেতে চাই, তুমি কি অনুমতি দেবে?

খাও না, যত খুশি খাও, জে বলল, কে তোমাকে নিষেধ করেছে?

মনে হলো জে বেশ ভালো মুডে আছে।

বার বন্ধ করে দেওয়ার পর এই প্রথম তারা দুজন একসঙ্গে বসল। বাতিগুলো সব নিভিয়ে দেওয়া। ফ্যান ও এয়ারকন্ডিশনার চলছে না। জায়গাটা জুড়ে অ্যালকোহল আর মানুষের ঘামের গন্ধ মিলিয়ে বাসি কেকের মতো একটা গন্ধ। র‍্যাট কাউন্টারের পেছনে ফ্রিজ থেকে একটা বিয়ার নিয়ে এল।

স্যরি, র‍্যাট আবারও বলল।

জে হেসে বলল, বারবার একই কথা বলছ কেন? বললাম তো কোনো সমস্যা নেই।

আসলে এখানে আসার কোনো প্ল্যান ছিল না। কিন্তু হঠাৎ করে ঘুম ভেঙে গেল। কোনোভাবেই ঘুম আসছিল না। ভাবলাম, এখানে এসে বিয়ার খাই।

একদমই সমস্যা নেই। তোমার যখন ইচ্ছা আসবে। তোমার যদি ক্ষুধা লেগে থাকে, তাহলে আমি তোমার জন্য কিছু একটা করে দিতে পারি। আলু কাটা আছে। ফ্রেঞ্চ ফ্রাই ভেজে দেব? বেশি সময় লাগবে না।

না ঠিক আছে। লাগবে না। বিয়ারই ঠিক আছে। আর কিছু দরকার নেই।

র‍্যাট প্রায় ঘোড়ার মতো বিয়ার টানল। এক চুমুকে পুরো গ্লাস শেষ করে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। বোতলের বাকিটুকু আবার গ্লাসে ঢালল যতক্ষণ পর্যন্ত না বিয়ারের বুদ্‌বুদগুলো স্থির হয়।

তুমি বিয়ার খাবে না? র‍্যাট জানতে চাইল।

জে মনে হলো একটু লজ্জা পেয়েছে। বলল, না। খাব না। আসলে শরীরে অ্যালকোহলও ঠিক সহ্য হচ্ছে না ইদানীং।

র‍্যাট খুবই অবাক হলো। জে-র শরীরে যে অ্যালকোহলও সহ্য হচ্ছে না, এই তথ্যটা সে জানে না। সে ভাবল, তার আশপাশের মানুষ সম্পর্কে সে কতটা কম জানে। তবে এটা ঠিক, জে-কে ঘিরে সব সময় একটা রহস্য আছে। সে এই শহরের একজন রহস্যমানব। তার ব্যাপারে আসলে কেউই তেমন কিছু জানে না। সবাই জানে, জে চীন থেকে এসেছে। কিন্তু এটুকুই। এর বেশি কিছু নয়।

জে নিজের সম্পর্কে কখনো কিছু বলে না। যদি কেউ কিছু জানতে চায়, শুধু ততটুকুই বলে যতটুকু না বললেই নয়। যেন সে খুব সাবধানে একটা জরুরি ডেস্কের ড্রয়ার খুলে তার ভেতর থেকে আরও সাবধানে জরুরি জিনিসটা বের করে। তারপর আবার ড্রয়ারটা বন্ধ করে দেয়।

জে চায়না থেকে এসেছে, কিন্তু চায়নার কোন শহরে তার বাড়ি, সেটা কেউ বলতে পারবে না। সে কী মনে করে জাপানের এই বন্দর শহরে এসে একটা মদের বার চালু করল, সেটা কেউ জানে না। র‍্যাট যখন হাইস্কুলে পড়ত, তাদের স্কুলের ফুটবল টিমে দুজন চায়নিজ ছাত্র ছিল। একজন স্ট্রাইকার হিসেবে খেলত, আরেকজন ছিল ডিফেন্সে। তারাও কেউ জানত না জে সম্পর্কে।

মিউজিক চালিয়ে দিই? জে বলল, মিউজিক শুনলে হয়তো তোমার ভালো লাগবে।

কথাটা বলে জে জুকবক্স চালু করল। র‍্যাট উঠে গিয়ে জুকবক্সে ভাঙতি কয়েন ফেলে পাঁচটা গান পরপর পছন্দ করে দিল। তারপর নিজের সিটে এসে বসল। আমেরিকান গায়ক ওয়েন নিউটনের অনেক পুরোনো একটা গান বাজতে শুরু করেছে ততক্ষণে।

তুমি নিশ্চয়ই বাড়ি চলে যেতে। আমি তোমাকে শুধু শুধু বসিয়ে রেখেছি, র‍্যাট বলল।

আরে কোনো সমস্যা নেই। বাড়িতে আমার জন্য কেউ বসে নেই, জে বলল।

তুমি একা থাকো?

সে রকমই।

র‍্যাট একটা সিগারেট ধরিয়ে আবারো ভাবল জে সম্পর্কে কতটা কম জানে।

জে বলল, আমার সঙ্গে একটা বিড়াল থাকে। সেটাকে যদি তুমি কারও সঙ্গে থাকা বলো, তাহলে আমি একটা বিড়ালের সঙ্গে থাকি বলতে পারো। আমার যখন খুব কথা বলতে ইচ্ছে করে, আমি অন্তত বিড়ালটার সঙ্গে কথা বলতে পারি।

তুমি বিড়ালের সঙ্গে কথা বলো! র‍্যাট অবাক হয়ে তাকাল।

জে দুবার মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ। আমরা অনেক দিন ধরেই একসঙ্গে আছি। একজন আরেকজনকে চিনি, বুঝতে পারি। আমি বুঝতে পারি সে কী ভাবছে। সেও আমার মনের কথা বেশ ভালোই বোঝে।

জুকবক্সে ততক্ষণে নতুন গান শুরু হয়ে গেছে। র‍্যাট ঠোঁটে সিগারেট ঝুলিয়ে পুরো বিষয়টা নিয়ে ভালো করে একবার ভেবে দেখল। তার মনে হলো, বিড়ালের সঙ্গে কথা বলার বিষয়টা ঠিকঠাক আছে। এ রকম হতেই পারে।

বিড়ালরা যখন চুপচাপ বসে থাকে, তখন ওরা কী ভাবে তুমি বলতে পারো? র‍্যাট বলল।

অনেক কিছুই ভাবে, জে বলল, ওদের ভাবনা তোমার আমার থেকে আলাদা কিছু না।

দারুণ।

জে কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বলল, ওর একটা পা নেই।

পা নেই! র‍্যাট অবাক হলো।

না। পঙ্গু বলতে পারো। চার বছর আগে এক শীতে আমার বাড়িতে এসে উঠেছিল। সারা শরীর রক্তে মাখামাখি। পা দেখে মনে হচ্ছিল সেখানে লাল রঙের স্ট্রবেরি জ্যাম লেগে আছে।

কী হয়েছিল?

ঠিক বলতে পারব না। গাড়ি চাপা পড়তে পারে। তবে তার অবস্থা খুব একটা ভালো ছিল না। গাড়ির চাকার নিচে পড়লে যে রকম জখম হয়, তার জখমটা সে রকম ছিল না। একটু অন্য রকম। মনে হচ্ছিল, লেদ মেশিন দিয়ে তার পা পিষে ফেলা হয়েছে। প্যানকেকের মতো একদম সমান হয়ে গিয়েছিল। আমার মনে হয় কোনো উন্মাদ কাজটা করেছে। মজা করতে গিয়ে করেছে সম্ভবত।

এটা কী করে সম্ভব? র‍্যাট বলল, কোন ধরনের উন্মাদ একটা বিড়ালের

সঙ্গে এ ধরনের মজা করতে পারে?

তুমি ঠিকই বলেছ, জে বলল, এ ধরনের একটা কাজ করার কোনো যৌক্তিক কারণ আসলেই নেই। বিড়ালটা খুবই শান্ত টাইপের। কখনো যন্ত্রণা দেয় না। সুতরাং তাকে এ রকম কঠিন কোনো শাস্তি দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। আমিও বুঝতে পারি না, যে লোক কাজটা করেছে, তার কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে। কিন্তু ঘটনাটা সত্য। এবং আমরা এ ধরনের উন্মাদ মানুষদের মধ্যেই বেঁচে আছি।

বিয়ারের গ্লাসে চোখ রেখে র‍্যাট কয়েকবার মাথা নাড়ল। তারপর বলল, আমি পুরো ব্যাপারটার মধ্যে কোনো অর্থ খুঁজে পাচ্ছি না।

যদি অর্থ খুঁজে না পাও, জে বলল, তাহলে তুমি বেঁচে গেলে। অর্থ খোঁজার চেষ্টা কোরো না। সেটাই সম্ভবত সবচেয়ে ভালো হবে।

জে সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে মুখ ভরে ধোঁয়া ছাড়ল। একটা সাদা মেঘ যেন উড়তে উড়তে অদৃশ্য হয়ে গেল পেছনের অন্ধকারে। দুজন দীর্ঘক্ষণ কোনো কথা বলল না। র‍্যাট একভাবে তার বিয়ারের গ্লাসের দিকে তাকিয়ে রইল। কোনো কারণ ছাড়াই কাউন্টারের ওপরে আঙুল ঘষল জে। জুকবক্সে তখন র‍্যাটের ঠিক করে দেওয়া শেষ গানটা বাজছিল।

র‍্যাট বলল, মাঝেমধ্যে মনে হয় এই যে পঁচিশটা বছর ধরে আমি বেঁচে আছি, এর মধ্যে আমি একেবারে কিছুই শিখতে পারিনি।

জে তার হাতের আঙুলের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে এই পৃথিবীতে আছি। এই বছরগুলোতে আমি একটা জিনিসই শুধু শিখেছি। তা হলো, যেকোনো জিনিস থেকেই তুমি কিছু শিখতে পারবে, যদি চেষ্টা করো। প্রতিদিন যে সাধারণ জিনিসগুলো তুমি দেখো, যে সাধারণ ঘটনাগুলো তোমার জীবনে ঘটে, সেগুলো থেকেই অনেক কিছু শেখার আছে। তোমাকে শুধু শেখার ইচ্ছেটুকু প্রকাশ করতে হবে। একবার একটা লেখায় পড়েছিলাম, সকালে তুমি কীভাবে দাড়ি কামাও, তার মধ্যেও একটা গভীর দর্শন লুকিয়ে আছে। এই দর্শনটুকু ছাড়া বেঁচে থাকা খুব কঠিন।

সম্ভবত তুমি কী বলতে চাচ্ছ সেটা আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু ...

কিন্তু পর্যন্ত বলার পর র‍্যাট আর কিছু বলল না। থেমে গেল। তার মনে হলো, কিন্তুর পরেরটুকু বলে কোনো লাভ নেই। তার বদলে সে বলল, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। মাঝরাতে তোমাকে শুধু শুধু অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলাম। আমার সঙ্গে গাড়ি আছে। চলো, তোমাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিই।

তার দরকার হবে না, জে বলল, আমার বাসা কাছেই। আমি হেঁটে হেঁটে চলে যাব। এটুকু পথ হাঁটতে আমার বেশ ভালোই লাগে।

আচ্ছা ঠিক আছে। গুড নাইট। তোমার বাড়ির বিড়ালটাকে আমার শুভেচ্ছা পৌঁছে দিয়ো।

দেব। তোমাকে ধন্যবাদ।

র‍্যাট একা একা গাড়ি পর্যন্ত হাঁটল। বাতাসটা বেশ ঠান্ডা। সে গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিল। তারপর কিছু একটা ভেবে বাড়ির দিকে না গিয়ে সমুদ্রের দিকে গাড়ি চালাতে শুরু করল। মেয়েটা যে অ্যাপার্টমেন্টে থাকে, তার থেকে একটু দূরে গিয়ে গাড়িটা পার্ক করল। সেখান থেকে বাসাটায় চোখ রাখা যায়। বিল্ডিংয়ে অনেকগুলো অ্যাপার্টমেন্ট। অনেকগুলো জানালা। কোনো কোনো জানালায় সে মানুষের ছায়া দেখতে পেল।

মেয়েটার বাসায় কোনো আলো জ্বলছে না। জানালাটা অন্ধকার হয়ে আছে। এমনকি বিছানার পাশের বাতিটাও জ্বলছে না। সম্ভবত সে গভীর ঘুমে তলিয়ে আছে। এক ভয়ংকর একাকিত্ব র‍্যাটকে পেয়ে বসল।

দূরে সমুদ্রের গর্জন বাড়ছিল। র‍্যাটের মনে হলো, সমুদ্রের পানি জলোচ্ছ্বাসের মতো এসে তাকে দূরে কোথাও ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। সে গাড়ির রেডিওটা চালাল। মাথার পেছনে হাত রেখে চোখ দুটো বন্ধ করে ফেলল। রেডিও জকির কথা শোনার চেষ্টা করতে গিয়ে বুঝতে পারল, তার শরীরটা বেশ ক্লান্ত। মাথার ভেতর চেপে বসা নানা ধরনের চিন্তা ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করল সে। গাড়িতে বসে রেডিও জকির অনর্থক বকবক শুনতে শুনতে একসময় গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল।

১১

যমজ দুই বোন মিলে আমাকে ডাকাডাকি শুরু করল। আমি তখন গভীর ঘুমে। বৃহস্পতিবার সকাল। অফিসে যেতে হবে। এমনিতেই ঘুম থেকে উঠে যেতাম। প্রতিদিন যে সময়ে উঠি, তার পনেরো মিনিট আগেই তারা আমার

ঘুম ভাঙাল। অবাক হয়ে ভাবলাম, কী হয়েছে। আমি সে মুহূর্তে কিছু না বলে উঠে গিয়ে বাথরুমে ঢুকলাম। বাথরুম সেরে সকালের খবরের কাগজটা নিয়ে বসলাম। সেটা একদম তাজা। যেন আমি আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে দিলে প্রিন্টিং প্রেসের কালি হাতে লেগে যাবে।

তুমি আমাদের জন্য একটা কাজ করে দিতে পারবে? ২০৮ বলল।

কী কাজ? জানতে চাইলাম আমি।

রোববার আমাদের একটা গাড়ি ঠিক করে দিতে পারবে? ২০৯ বলল।

পারব বোধ হয়, আমি বললাম, কিন্তু তোমরা কোথায় যাবে?

ওকুতামা লেক ... যে জায়গাটায় পানির বাঁধ দিয়েছে ... ওই জায়গাটায়... ওগুচি রিজার্ভার।

ওগুচি রিজার্ভার! আমি অবাক হয়ে বললাম।

তারা মাথা নাড়ল।

সেখানে গিয়ে তোমরা কী করবে?

শেষকৃত্য।

কার শেষকৃত্য?

কার আবার? আমাদের সুইচ প্যানেলের। সে কাল রাতে মরে গেছে।

ওহ, বলে আমি মাথা নাড়লাম। আবার পেপারে মনোযোগ দিলাম। সম্ভবত তারা ওগুচি রিজার্ভারের পানিতে সুইচ প্যানেলটা ফেলে দেবে। একটা সুইচ প্যানেলের জন্য নিঃসন্দেহে সেটা বেশ সম্মানজনক অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে রোববার সকাল থেকেই ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। আমি ঠিক নিশ্চিত ছিলাম না, একটা সুইচ প্যানেলের শেষকৃত্যের জন্য কী ধরনের আবহাওয়া ভালো হবে। যমজ বোনেরাও এই ব্যাপারে পরিষ্কার করে কিছু বলতে পারছিল না। সুতরাং চুপ করে থাকাটাই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে হলো।

আমার বিজনেস পার্টনারের আকাশি-নীল রঙের ভক্সওয়াগন গাড়িটা ধার করেছিলাম সেদিনের জন্য। চাবিটা আমার হাতে তুলে দেওয়ার সময় সে বলেছিল, হুমম ... ডেটে যাচ্ছ মনে হচ্ছে। তাহলে শেষ পর্যন্ত একটা মেয়ে তোমার কপালে জুটল।

আমি উত্তরে কিছু বলতে পারিনি। গাঁইগুঁই করে 'উমম' জাতীয় একটা শব্দ

করেছিলাম।

গাড়িটার ভেতরে বেশ একটা পারিবারিক আবহ। গাড়ির মালিকের যে বউ বাচ্চা আছে, সেটা বেশ বোঝা যায়। মেয়েদের ম্যাগাজিন আছে। এমন কিছু অডিও টেপ আছে যা কেবল মেয়েরাই পছন্দ করে। পেছনের সিটগুলোতে বাচ্চাদের মিল্ক চকলেট মাখানো। ছোপ ছোপ লাল দাগ লেগে আছে, জমাটবাঁধা রক্তের মতো। দেখে মনে হচ্ছে, গাড়ির মধ্যে কোনো রক্তক্ষয়ী গোলাগুলি হয়ে গেছে।

গাড়িতে ক্যাসেট প্লেয়ার আছে। কিন্তু যে ক্যাসেটগুলো রাখা তার একটাও শোনার মতো না। তাই আমরা দেড় ঘণ্টা সময় নিঃশব্দে বসে রইলাম। বৃষ্টি একটু একটু করে বাড়ল, আবার হুট করে একসময় কমে গেল, তারপর আবার বাড়ল, আবার কমল। এভাবে নিয়মিত বিরতিতে বাড়া-কমার খেলাটা চলতে লাগল। পুরো জার্নিতে একমাত্র যে বিষয়টা ধারাবাহিক ছিল তা হলো, হাইওয়েতে কোনো গাড়ির ফুস করে বেরিয়ে যাওয়ার শব্দ। সে শব্দ শুনতে শুনতে আমি গাড়ি চালিয়ে গেলাম।

২০৮ গাড়িতে আমার পাশে বসেছিল। আর ২০৯ পেছনে থার্মোফ্লাক্স কোলে নিয়ে সিটে হেলান দেওয়া। পাশের সিটে একটা শপিং ব্যাগের মধ্যে সুইচ প্যানেলের মৃতদেহটা রাখা। দুজনের মুখই বিষণ্ন, শেষকৃত্যের জন্য একেবারে প্রস্তুত তারা। আমিও আমার মুখটাকে তাদের মতো করুণ বানিয়ে ফেললাম। আমরা সেই শান্ত, সমাহিত ভাবটা পথজুড়ে ধরে রইলাম। এমনকি মাঝখানে একটা হাইওয়ে রেস্টুরেন্টে বসে যখন রোস্টেড কর্ন খাচ্ছিলাম, তখনো ভাবগাম্ভীর্যের কোনো কমতি ছিল না।

আমরা যেখানে গিয়ে পৌঁছালাম, সে জায়গাটা কুকুর দিয়ে ভরা। তারা বৃষ্টির মধ্যে এমনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, যেন অ্যাকুরিয়ামে মাছ সাঁতার কাটছে। বাধ্য হয়ে আমাকে বারবার হর্ন বাজাতে হলো। কিন্তু কুকুরগুলো তাদের ইচ্ছামতো রাস্তার মধ্যে ঘুরে বেড়াল। বৃষ্টি কিংবা গাড়ির হর্ন কোনো ব্যাপারেই তাদের মধ্যে খুব একটা আগ্রহ দেখতে পেলাম না। বরং আমার হর্ন শুনে তারা যেন কিছুটা বিরক্ত হলো।

অনেকক্ষণ সিগারেট খাচ্ছিলাম না দেখে ২০৮ আমার ঠোঁটে একটা সিগারেট রেখে আগুন ধরিয়ে দিল। এমনভাবে বৃষ্টি পড়ছিল যেন কখনো থামবে না। অক্টোবর মাসে যখন বৃষ্টি নামে তখন এমনই হয়। শুরু হলে শেষ হওয়ার নাম নেই। চলতেই থাকে। পুরো রাস্তা পানিতে ডুবে ছিল।

হাইওয়েকে মনে হচ্ছিল এক বিশাল জলাভূমি। আমরা সেই জলেই সুইচ প্যানেলটাকে ডুবিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু সে রকম কোনো ফাঁকিবাজি করলে তার আত্মাকে হয়তো পূর্ণ সম্মান দেওয়া হতো না।

উঁচু-নিচু পাহাড়ি রাস্তা ধরে গেলে গভীর বন। সেখানেই লেক। অনেকখানি জায়গা জুড়ে নদীতে বাঁধ দিয়ে লেকটা তৈরি করা হয়েছে। রোববারে সেখানে এমনিতে প্রচুর মানুষের বেড়াতে আসার কথা। বৃষ্টির কারণে অবশ্য কেউ নেই সেদিন। যত দূর চোখ যায়, পানি আর পানি। দুপাশে পাহাড়। লেকের পানিতে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছিল। আমি ভাবতেও পারিনি যে দৃশ্যটা এত সুন্দর হবে। আমরা নদীর পাড়ে গাড়ির ভেতর বসে বিস্কুট খেলাম। যমজ বোনেরা তিন ধরনের বিস্কুট এনেছিল। বাটার ক্রিম, কফি ক্রিম আর ম্যাপল ফ্লেভারের। আমরা তিনজন সমান ভাগ করে সেগুলো খেয়ে ফেললাম।

থার্মোফ্লাস্কে কফি ছিল। ভাগে দুই কাপ করে পড়ল। কফিতে চুমুক দিতে দিতে সামনের অসম্ভব সুন্দর দৃশ্যটা দুচোখ ভরে দেখলাম। প্রায় একই সঙ্গে আমাদের তিনজনের কফি খাওয়া শেষ হলো। একই সঙ্গে আমাদের জামাকাপড়ে লেগে থাকা বিস্কুটের গুঁড়ো ঝেড়ে ফেললাম। কারও মুখ থেকে কোনো কথা বের হলো না।

পুরোটা সময় নদীর পানিতে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ল। প্রায় নিঃশব্দে, ভারী কার্পেটের ওপর খবরের কাগজ পড়লে যে রকম শব্দ হয়, বৃষ্টির ফোঁটা পড়ার শব্দ ছিল ঠিক তেমন। ক্লদে লেলুচের সিনেমাগুলোতে এ রকম নান্দনিকভাবে বৃষ্টি পড়তে দেখা যায়।

কাজটা করা যাক, অবশেষে যমজ বোনদের একজন বলল।

অন্যজন সে কথায় সায় দিল।

আমি আমার ঠোঁটের সিগারেটটা নিভিয়ে ফেললাম। সিগারেট টানতে টানতে এ রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার কোনো মানে নেই। গাড়িতে ছাতা ছিল। বাসা থেকে বের হওয়ার সময় বৃষ্টি পড়ছে দেখে আমরা ছাতা নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু সে ছাতা খোলা হলো না। গাড়িতেই রয়ে গেল। আমরা ঝিরঝির বৃষ্টির মধ্য দিয়ে সুইচ প্যানেল হাতে বিষণ্ন চেহারায় ব্রিজের ওপর উঠে দাঁড়ালাম।

দুই বোনের যার হাতে সুইচ প্যানেলের ব্যাগটা ধরা ছিল সে বেশ নাটকীয়ভাবে ব্যাগটা আমার হাতে তুলে দিল। যেহেতু প্যানেলটা আমার বাসায়

ছিল, তাই ওটার ব্যাপারে আমার অধিকার একটু বেশি। অন্তত দুই বোন বোধ হয় সে রকমই ভেবেছিল। পুরো দৃশ্যটা ছিল অসম্ভব বেদনাদায়ক। বৃষ্টির কারণে তা রীতিমতো করুণ হয়ে উঠল। অন্য কোনো মানুষ যদি সেই মুহূর্তে আমাদের তিনজনকে দেখত, গভীর কোনো দুঃখে তাদের হৃদয় হয়তো কেঁপে উঠত।

এখন প্রার্থনাটুকু সেরে নাও, ২০৮ যেন ঘোরের মধ্যে বলল।

প্রার্থনা! আমি মিনমিন করে বললাম।

আসলে প্রার্থনা যে করতে হবে, এই ব্যাপারটা আমার মাথায় ছিল না। প্রার্থনা কীভাবে করে বা এ সময় কী বলে সে ব্যাপারে আমার ন্যূনতম ধারণা নেই। অসহায় চোখে তাদের দিকে তাকালাম।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় প্রার্থনা করবে না? ২০৯ অবাক হয়ে বলল।

অবশ্যই, বললাম আমি, কিন্তু একটা ছোট্ট সমস্যা আছে। আমি জানি না কীভাবে কাজটা করে।

মন থেকে যেটা আসে সেটাই করো, ২০৮ বলল।

যেকোনো প্রার্থনা, ২০৯ বলল, সুইচ প্যানেলের আত্মার শান্তি কামনা করে কিছু একটা বলতে হবে, তারপর সেটাকে পানিতে ফেলে দেবে। এটাই নিয়ম। করতেই হবে।

যেটা করতেই হবে সেটা ফেলে রাখার কোনো মানে নেই। আমি ব্রিজের ওপর সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত বৃষ্টিতে ভেজা। আমি খুঁজে বের করার চেষ্টা করলাম সঠিক শব্দগুলো। যমজ বোনদের চোখ একবার আমার ওপর আর একবার সুইচ প্যানেলের ওপর ঘোরাঘুরি করছে। মেপে নিচ্ছে। তাদের চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম, প্রার্থনার ব্যাপারটা নিয়ে তারা বেশ দুশ্চিন্তায় আছে। আশঙ্কা করছে আমার ভুলের কারণে হয়তো সুইচ প্যানেলের আত্মা শেষ পর্যন্ত শান্তি পাবে না।

অবশেষে আমি বারবার পড়ে প্রায় মুখস্থ করে ফেলা দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের *ক্রিটিকস অব পিওর রিজন* বইটা থেকে গড়গড় করে কিছু শব্দ বললাম। শব্দগুলোকে এই গম্ভীর পরিবেশের সঙ্গে যথেষ্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হলো। স্বস্তির দিক হলো, যমজ দুই বোন বইটা পড়েনি। কানে ঝংকার তোলে এ রকম কঠিন কিছু শব্দ বলতে পারলেই সম্ভবত পার পাওয়া যাবে।

আমি বিড়বিড় করে বললাম, ‘দর্শনের পবিত্র দায়িত্ব হচ্ছে মানুষের ভুলগুলো ভেঙে দেওয়া, সকল বিভ্রান্তির অবসান ঘটানো, বিভ্রান্তি দূর করে

পৃথিবীর বুকে শান্তি ফিরিয়ে আনা। (একটু থামলাম) প্রিয় সুইচ প্যানেল, তুমিও এক অনন্য দর্শন। বহু বছর ধরে তুমি তোমার মহান দায়িত্ব পালন করেছ। এখন তুমি জলের বুকে আরামে ঘুমাও। শান্তি দুবাহু প্রসারিত করে তোমাকে বুকে টানুক।'

এখন এটা পানিতে ফেলে দাও, ২০৮ বলল।

কোনটা? আমি কিছু না বুঝে জিজ্ঞেস করলাম।

সুইচ প্যানেল, ২০৯ বলল।

আমি ডান হাতে শরীরের সবটুকু শক্তি এক করে ৪৫ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে সুইচ প্যানেলটা ছুড়ে মারলাম। যতটা জোরে সম্ভব। একটা নিখুঁত বৃত্তচাপ তৈরি করে প্যানেলটা বাতাসে ভাসতে ভাসতে পানিতে গিয়ে পড়ল। পানি ছলকে উঠল।

তোমার প্রার্থনাটা সত্যিই খুব সুন্দর হয়েছে, ২০৮ বলল।

তুমি কি এটা নিজে নিজে বানিয়েছ? ২০৯ জানতে চাইল।

সম্ভবত, আমি বললাম।

তিনজন দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম।

নীরবতা ভেঙে ২০৮ জিজ্ঞেস করল, এটা কতটা গভীর?

অনেক গভীর, বললাম আমি।

এখানে মাছ আছে? ২০৯ জানতে চাইল।

যেখানে পানি আছে, সেখানেই মাছ আছে।

তারপর আমাদের কথা শেষ হয়ে গেল। পৃথিবীর বুকে বিরামহীনভাবে বৃষ্টি পড়ছিল। আমরা সেই বৃষ্টির মধ্যে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। তখন যদি কেউ দূর থেকে আমাদের দেখত, নিশ্চয়ই আমাদের তিনজনকে একসঙ্গে একধরনের স্মৃতিস্তম্ভ ভেবে ভুল করত।

১২

কয়েক দিন ধরেই বাতাসে শীতের আমেজ টের পাচ্ছিলাম। রোববারের বৃষ্টির পর সেটা বাড়ল। বৃহস্পতিবার সকালে অফিস যাওয়ার আগে আমি লকার থেকে শীতের কাপড় বের করলাম। একটা পাতলা সোয়েটার পছন্দ হলো।

বগলের নিচে খানিকটা সুতো উঠে গেছে। কিন্তু আশা করা যায়, আমার বগলের নিচে কারও চোখ দেওয়ার প্রয়োজন পড়বে না। অনেকখানি সময় নিয়ে দাড়ি কামিয়ে একটা সুতির প্যান্ট পরে নিলাম। বুটজোড়া পায়ে গলানোর পর আয়নায় একবার নিজেকে দেখলাম। সব ঠিক আছে, একদম ফিটফাট। শুধু পায়ের বুটগুলোকে বেখাপ্পা রকমের বড় দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে ছোট-ছোট দুটো বাচ্চা কুকুর পায়ের পাতার ওপর থাবা গেড়ে বসে আছে। যমজ বোনেরা পুরো ঘর খুঁজে আমার সিগারেটের প্যাকেট, লাইটার, মানিব্যাগ আর কমিউটার ট্রেনের পাস জোগাড় করে দিল।

অফিসে নিজের ডেস্কে বসার পর প্রতিদিন যা যা করি তাই করলাম। প্রথমেই সেক্রেটারি মেয়েটার বানিয়ে দেওয়া কফি খেলাম। এরপর ছয়টা এইচ-বি পেনসিল ছুরি দিয়ে সুন্দর করে চাঁছলাম। দুপুরের দিকে লাঞ্চ করে আবার গেলাম সেই পেট-শপে। এবার বিড়াল একটা বেড়ে গেছে। একটা বিড়াল কী করে দুটো হয়ে গেল তা নিয়ে ভাবতে ভাবতে খাঁচার মধ্যে আমার আঙুল ঢোকালাম। বিড়াল দুটো একসঙ্গে লাফিয়ে উঠল এবং আঙুলে কামড় বসাতে গেল। দোকানের মালিক মনে করল, আমি বিড়াল খুব ভালোবাসি। কিন্তু টাকা নেই দেখে কিনতে পারছি না। তার মনে সামান্য দয়া হলো। সে এগিয়ে এসে খাঁচা তুলে বিড়াল দুটো বের করল। তাদের আমার হাতে তুলে দিল। কাশ্মীরি চাদরের মতো নরম তাদের লোম। আমি তাদের মুখের সঙ্গে চেপে ধরলাম।

এরপর সেই দোকান থেকে নেহায়েত ভদ্রতা করে হলেও কিছু একটা কিনতে হয়। আমি এক বাক্স বিড়ালের খাবার কিনলাম। এমন একটা ভাব করলাম, বাড়িতে আমার পোষা বিড়াল আছে। তাদের জন্য খাবারগুলো নিচ্ছি। বিড়ালের খাবার হাতে অফিসে ফেরার পর মেয়েটা আমার দিকে অবাক হয়ে তাকাল। একবার হাতের বাক্স আর একবার সোয়েটারের দিকে তাকাচ্ছিল সে। তারপর সোয়েটার থেকে বিড়ালের লোম ঝাড়তে শুরু করল।

রাস্তার পাশে একটা পেট-শপ আছে। ওখানে বিড়ালের সঙ্গে খেলছিলাম, আমি কৈফিয়তের মতো করে বললাম।

সেটা ঠিক আছে। তোমার সোয়েটারের বগলের নিচে খানিকটা সুতো ছিঁড়ে গেছে, মেয়েটা বলল।

আমি জানি। গত বছর ছিঁড়েছে।

জানো!

হুমম।

ওটা খুলে আমার কাছে দাও। দেখি কত দূর কী করতে পারি।

আমি খুলে দিতেই সে সোয়েটারটা হাতে নিয়ে চেয়ারে পা ছড়িয়ে বসল। বগলের দিকে যেখানে সুতো বেরিয়ে গেছে, সে জায়গাটার সুতোগুলো টেনে সোজা করল। আমি নিজের ডেস্কে ফিরে গেলাম। অনেক কাজ জমে গেছে। কাজ শুরুর অংশ হিসেবে প্রথমেই আরও ছয়টা পেনসিল শার্প করে ফেললাম। মনটা একটু হালকা হলো। শুরুটা হয়ে গেছে। শেষও নিশ্চয়ই হবে।

প্রতিদিন যত ঝামেলাই হোক না কেন, কাজগুলো ঠিকঠাক শেষ করি। এ কারণে কেউ কখনো আমার ভুল ধরতে পারে না। অফিসে আমি নিজেকে এমন একজন মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছি, যে নির্দিষ্ট সময়ে কাজগুলো যে করেই হোক শেষ করে ফেলবে। কেউ এ নিয়ে কখনো অভিযোগ করতে পারবে না। সেজন্য আমার যতই কষ্ট হোক, আমি দমে যাই না কখনো। কাজগুলো করতে গিয়ে মাঝে মাঝে আমার এমনই যন্ত্রণা হয় যে মনে হয়, আমি কোনো কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে বন্দী আছি। এমনকি সেই ক্যাম্পের নামটাও আমি জানি। জার্মানির অসউইথজ কনসেনট্রেশন ক্যাম্প। সিনেমায় দেখা সেই ক্যাম্পের ছবিও আমার চোখে ভাসে।

সমস্যাটা হচ্ছে, সেই ক্যাম্পে আমার বন্দী থাকার কোনো কারণ নেই। হিটলারের পতনের পর ক্যাম্পটা নিশ্চয়ই তুলে দেওয়া হয়েছে। আধুনিক পৃথিবীতে এ ধরনের ভয়াবহ জিনিস কল্পনা করা কষ্ট। আসলে সমস্যাটা আমারই। আমি নিজেকে উদ্ভট উদ্ভট জায়গায় কল্পনা করি। চোখ বুজে যে জায়গাগুলোয় নিজেকে দেখতে পাই, পৃথিবীতে এখন আর সেগুলো নেই। জার্মানির কনসেনট্রেশন ক্যাম্প যেমন এখন আপনি আর খুঁজে পাবেন না, তেমনি টু সিটার টর্পেডো যুদ্ধবিমানও পাবেন না। সেই বিমানের ককপিটে বসার কোনো কারণ নেই আমার। তবু সেখানে বসে থাকি আমি। সময় এগিয়ে যাচ্ছে। অথচ আমি ত্রিশ বছর আগের জিনিসপত্র নিয়ে পড়ে আছি। নিজেকে বদলাতে পারিনি।

তিনটার দিকে মেয়েটা আমার ডেস্কে ফিরে এল। এর মধ্যে সোয়েটারটা সেলাই করে ফেলেছে। তার কাছে সুই, সুতো কী করে এল জানি না। কিন্তু দেখাই যাচ্ছে কাজটা সে করে ফেলেছে। দুই হাতে সোয়েটার, চা আর বিস্কুট সামলাতে রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছে সে। তার হাত থেকে জিনিসগুলো নিয়ে টেবিলে রাখলাম। বিস্কুটে কামড় বসালাম। কুড়মুড় শব্দে রুমের বাতাস ভরে গেল।

যদি তোমার সময় থাকে, সে বলল, একটু কথা বলতাম।

বলো, আমি বিস্কুট চাবাতে চাবাতে বললাম।

একটা বুদ্ধি লাগবে।

কী বুদ্ধি?

নভেম্বরে টোকিওর বাইরে বেড়াতে যাওয়ার কথা আমাদের, মনে আছে?

খেয়াল হলো, নভেম্বরে অফিসের তিনজনের একসঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার কথা। বললাম, মনে থাকবে না কেন?

হোক্কাইডো গেলে কেমন হয়? সে জানতে চাইল।

ভালো জায়গা, বললাম আমি, যাওয়া যেতে পারে। আমার কোনো অসুবিধা নেই। তুমি যেতে চাইলে আমরা সেখানেই যাব।

ঠিক আছে তাহলে। হোক্কাইডো ফাইনাল। কিন্তু, একটা প্রশ্ন ছিল।

কী প্রশ্ন?

তোমার কি মনে হয়, নভেম্বরে সেখানে ভালুক থাকতে পারে?

না।

তুমি শিওর? আমি তো শুনেছি যে হাইবারনেটে যাওয়ার আগে এই সময়টায় ওরা খাবার জোগাড়ে বের হয়।

বের হয়। কিন্তু সেটা নভেম্বরের আগে। খাবারদাবার জোগাড় করে হাইবারনেটে চলে যায় নভেম্বর নাগাদ। আমি যেমন সোয়েটার বের করেছি, ভালুকদেরও শীত টের পাওয়ার কথা।

ভালুক যে তার ওপর হোক্কাইডোর রাস্তাঘাটে ঝাঁপিয়ে পড়বে না, এটা বুঝতে পেরে মনে সে একধরনের স্বস্তি পেল। বলল, আচ্ছা ঠিক আছে। বাঁচা গেল। আরেকটা কথা, তুমি কি আজ ফ্রি আছ?

আজ মানে কখন?

ডিনার টাইমে। কাছেই একটা ভালো লবস্টার রেস্টুরেন্ট আছে। আমি চিনি। অফিস ছুটির পর যাবে?

যাওয়া যেতে পারে। বহুদিন বড় গলদা চিংড়ি খাই না।

রেস্টুরেন্টটা একটা আবাসিক এলাকার মধ্যে। চারদিকের পরিবেশ শান্ত। আমাদের অফিস থেকে ঠিক হাঁটা পথের দূরত্ব নয়। ক্যাব নিলে মিনিট পাঁচেক লাগে। আমরা রেস্টুরেন্টে ঢুকে টেবিলে বসতেই কালো স্যুট পরা

এক ওয়েটার নিঃশব্দে উদয় হলো। বিশাল নৌকা সাইজের এক মেনু রাখল টেবিলে। আমরা শুরুতে দুটো বিয়ার অর্ডার করলাম।

এখানকার চিংড়িগুলো আসলেই দারুণ, মেয়েটা বলল, একদম তাজা। ফ্রোজেন আইটেম না। পানিতে রেখে দেয়, সেই অবস্থায়ই তুলে নিয়ে চুলার পানিতে ছাড়ে। জীবন্ত সেদ্ধ করে।

বাহ, চমৎকার তো!

আমি বিয়ারে চুমুক দিলাম। ভাবার চেষ্টা করলাম, মেয়েটা মনে মনে কী ভাবছে। এখানে সে নিশ্চয়ই গলদা চিংড়ি রান্নার প্রক্রিয়া নিয়ে গল্প করতে আসেনি। কিছু একটা বলার আছে তার। কীভাবে শুরু করবে বুঝে উঠতে পারছে না। তার মুখের দিকে তাকালাম। চোখে-মুখে স্পষ্ট অস্বস্তি বোঝা যাচ্ছে। গলায় একটা সোনার চেইন পরেছে। অন্যদিন এটা পরে না। সরু আঙুলগুলো চেইনের ওপর ঘোরাঘুরি করছে।

তোমার সম্ভবত কোনো কথা বলার আছে, আমি বললাম, খাবার আসার আগেই সেগুলো বলে ফেলো। খেতে খেতেও বলতে পারো। তোমার ইচ্ছা।

কথাটা বলেই মনে হলো ভুল করে ফেলেছি। নিজ থেকে প্রসঙ্গটা তোলা উচিত হয়নি। ওর দরকার হলে নিজেই বলবে। কিন্তু তখন আর কথাটা ফেরানোর কোনো উপায় নেই। আসলে এই ভুলগুলো আমার বারবার হয়। কখন কোন কথাটা বলতে হবে, সেটা বুঝে উঠতে পারি না।

মেয়েটা মৃদু হাসল। হাসল না বলে বরং বলা যায়, তার ঠোঁটটা এক ইঞ্চির ঠিক দশ ভাগের এক ভাগ পরিমাণ ফাঁকা হলো। তারপর সেই ফাঁকাটা বন্ধ হয়ে গেল। রেস্টুরেন্ট একদম খালি। আমরা দুজন ছাড়া আর কোনো কাস্টমার নেই। কোথাও কোনো শব্দ হচ্ছে না। আমি অবশ্য চোখ বন্ধ করে গলদা চিংড়ির শুঁড় নাড়ানোর শব্দ শুনতে পেলাম।

তুমি যে কাজটা করো, সেটা কি তোমার পছন্দ? মেয়েটা বলল।

তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না, আমি বললাম।

মানে অফিসের কাজ।

আরেকটু ডিটেইলসে বলো।

প্রতিদিন অফিসে আসছ, অনুবাদের কাজ করছ। তারপর বাড়ি যাচ্ছ। পরদিন আবার অফিসে আসছ। শনিবার বিকেলে আমরা ডিস্কোতে গিয়ে খুব নাচানাচি করছি। ভাব করছি যে দারুণ মজা হলো। তোমার কি মনে হয়, এই

জীবনটা নিয়ে তুমি সন্তুষ্ট?

জটিল প্রশ্ন। কিন্তু আমার জন্য উত্তরটা দেওয়া খুব সহজ। উত্তরটা হচ্ছে, আমি জানি না। আসলে সেভাবে কখনো ভেবে দেখিনি। এটুকু শুধু বলতে পারি, কাজ নিয়ে কোনো অভিযোগ নেই আমার। বেশ তো দিন কেটে যাচ্ছে।

আমারও কোনো অভিযোগ নেই, সে বলল, বেতন-কড়ি ভালো। সুযোগ সুবিধা ভালো। বছরে দুবার ছুটিও পাচ্ছি বেড়াতে যাওয়ার জন্য। বোনাসও পাচ্ছি বড়সড় রকমের। সবচেয়ে বড় কথা, আমার যারা বস মানে তুমি আর তোমার বন্ধু, তোমরা দুজনই খুব ভালো মানুষ।

আমি চুপ করে রইলাম। কী বলব ভেবে পেলাম না। আসলে গত কয়েক বছরে আমি এ রকম পরিস্থিতিতে পড়িনি। কারও খুব বেশি কাছে যাওয়া হয়নি। তাই এ রকম কাছাকাছি বসে কেউ একজন আমাকে তার মনের কথাও বলেনি।

আমার বয়স মাত্র বিশ বছর, মেয়েটা বলল, সামনে পুরোটা পথ পড়ে আছে। এখন যে কাজটা করছি, সেটা শুরু হতে পারে। কিন্তু সেভাবে আমি শেষ করতে চাই না। এই যে জীবনটা কাটাচ্ছি, এই জীবনে আমি সন্তুষ্ট না। আমি কোনো কিছুর মধ্যে কোনো অর্থ খুঁজে পাই না। মনে হয়, অর্থহীনভাবে বেঁচে আছি।

ওয়েটার নিঃশব্দে টেবিলে খাবার রেখে গেল।

আমি মেয়েটাকে বললাম, তুমি ঠিকই বলেছ। তোমার বয়স এখনো কম। সত্যি কথা বলতে কি, জীবনটা এখনো তুমি শুরু করোনি। সামনে আরও দিন আসবে। তুমি একসময় প্রেমে পড়বে, তারপর একদিন বিয়ে করবে। তখন সবকিছু বদলে যাবে। তখন হয়তো জীবন কোনো একটা অর্থ নিয়ে তোমার সামনে এসে দাঁড়াবে।

কিছুই বদলাবে না, সে প্রায় ফিসফিস করে বলল, কখনো কারও সঙ্গে প্রেম হবে না আমার। কেউ আমাকে ভালোবাসবে না। আমার জীবনটা মানুষের সোয়েটার সেলাই করেই কেটে যাবে। তারপর যে সময়টুকু বেঁচে যাবে, সে সময় আমি কিচেনে তেলাপোকা মারব। এবং এভাবে করে একদিন আমি পৃথিবীর সব তেলাপোকা মেরে ফেলব। সেদিন আমার বেঁচে থাকার প্রয়োজন ফুরোবে হয়তো। আমি মরে যাব।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। মনে হলো, হঠাৎ করে আমার বয়সটা কয়েক বছর বেড়ে গেছে।

দেখো তুমি অনেক কিউট এবং লক্ষ্মী একটা মেয়ে, বললাম আমি, একই সঙ্গে

সুন্দরী। শুধু সুন্দরী নও, তোমার বুদ্ধিও বেশ ভালো। তুমি যেগুলো নিয়ে ভয় পাচ্ছ, সেগুলো তোমার জীবনে ঘটবে, সে রকম কোনো কারণ আমি দেখি না।

মেয়েটা একেবারে চুপ হয়ে গেল। নীরবে লবস্টার খেতে লাগল। আমিও আর কোনো কথা খুঁজে পেলাম না। কিছু একটা বলার জন্য পাগলের মতো কথা হাতড়ালাম। কথা নেই। হারিয়ে গেছে। তার বদলে লেকের গভীরে তলিয়ে যাওয়া সুইচ প্যানেলটার কথা মনে পড়ল। সেটা কেন পড়ল কে জানে? অবশেষে মেয়েটা কথা খুঁজে পেল।

তোমার যখন বিশ বছর বয়স ছিল, তখন তুমি কী করতে? সে জানতে চাইল।

একটা মেয়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল তখন, বললাম আমি, সেটা ১৯৬৯-এর কথা। সেই সময়টা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় ছিল।

তারপর কী হলো?

কী আর হবে? যা সব সময় হয়, ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল।

তোমার কষ্ট লাগেনি?

তখন হয়তো লেগেছিল। কিন্তু সেই সময়টা থেকে দূরে এসে এখন মনে হয়, ভালোই হয়েছিল।

আমরা খেতে খেতে রেস্টুরেন্টে আরও কিছু কাস্টমার এল। আমাদের মতো কথা খুঁজে পাওয়ার কোনো সমস্যা ছিল না তাদের। প্রচুর কথা বলছিল সবাই। তাদের কাঁটাচামচ আর ছুরির শব্দে রেস্টুরেন্ট ভরে গেল। লবস্টার শেষ করে আমি দুজনের জন্য কফি অর্ডার করলাম।

এখন কী অবস্থা তোমার? সে বলল, তোমার জীবনে এখন কেউ আছে?

যমজ বোনদের কথা বলব কি না একবার ভাবলাম। পরে বললাম, না নেই।

তোমার একা লাগে না?

লাগে। কিন্তু সেটাই আমার বেশ অভ্যাস হয়ে গেছে। আসলে অভ্যাস করে ফেলেছি।

অভ্যাস কী করে করলে?

ট্রেনিং নিয়েছি বলতে পারো।

এ বিষয়ে ট্রেনিং পাওয়া যায় নাকি? কী রকম ট্রেনিং? বলো তো শুনি।

আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়াটাকে দুই মিটার দূরে তার মাথার ওপরে তাক করলাম। তারপর ঠোঁট দুটো গোল করে নিখুঁতভাবে ছাড়লাম।

আমার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে, আমি বললাম, সম্ভবত এই ক্ষমতাটা

আমি জন্মসূত্রে অর্জন করেছি। সেটা হচ্ছে, আমি যা চাই তা সব সময়ই পেয়ে যাই। কিন্তু যখন কিছু একটা পেয়ে যাই, প্রতিবারই মনে হয়, ঠিক এই জিনিসটা আমি চাইনি। অন্য কিছু চাওয়া উচিত ছিল। সবচেয়ে বাজে ব্যাপার হলো, যে জিনিসটা আমি হাতে পেয়েছি, সেটা পেতে গিয়ে হয়তো অন্য আরেকটা জিনিস হারাতে হয়েছে। সেই জিনিসটা আমি কোনোভাবেই হারাতে চাইনি। তুমি কি আমার কথা বুঝতে পারছ?

কিছুটা, সে বলল।

তোমার বিশ্বাস হবে না, কিন্তু কথাটা সত্যি। তিন বছর আগে বিষয়টা প্রথম বুঝতে পারি। তাই ঠিক করেছি এ জীবনে আর কিছু চাইব না।

সে মাথা নেড়ে বলল, তুমি কি এভাবেই জীবন কাটিয়ে দেবে ঠিক করেছ?

সম্ভবত, বললাম আমি, তাতে করে অন্তত হারানোর ভয় থাকবে না। কিছু একটা পেতে গিয়ে কিছু একটা নিজের হাতে নষ্ট করব না। কাউকে কষ্ট দিতে হবে না।

সে ক্ষেত্রে সম্ভবত তোমার মানুষের মধ্যে বেঁচে থাকার দরকার নেই। একটা জুতোর বাক্স খুঁজে বের করো এবং সেখানে ঘর বসাও।

সেটা করা যেতে পারে। ভালো বুদ্ধি।

আমরা স্টেশন পর্যন্ত পাশাপাশি হেঁটে গেলাম। ঠান্ডা বাতাস বইতে শুরু করল। সোয়েটারটার ভেতরে একরকম আরামদায়ক উষ্ণতা টের পেলাম।

আমি অনেক জ্বালালাম তোমাকে। তুমি নিশ্চয়ই বিরক্ত হয়েছ আমার সমস্যাগুলো শুনে, সে বলল।

না, ঠিক আছে। বিরক্ত কেন হব? বললাম আমি।

এমনি মনে হলো। অসুবিধে নেই। তুমি ওগুলো মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলো। আমি নিজেই কিছু একটা সমাধান বের করার চেষ্টা করব।

স্যরি, তোমাকে খুব বেশি সাহায্য করতে পারলাম না।

না, সেটাও না। আসলে আমি ঠিক কোনো সমাধান পাব বলে তোমাকে ওগুলো বলেছি, তেমনও না। কাউকে বলাটা জরুরি ছিল। খুবই জরুরি। তোমার কাছে কথাগুলো বলতে পেরে আমার মন কিছুটা হালকা হয়েছে। সেটাও কম না।

আমাদের দুজনের ট্রেন একই প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়াল। ট্রেনে ওঠার ঠিক আগে সে আমাকে শেষবারের মতো জিজ্ঞেস করল, সত্যি তোমার কখনো

একা লাগে না?

আমি প্রশ্নটার একটা ঠিকঠাক উত্তর খুঁজে বের করার আগেই মেয়েটা ট্রেনে উঠে গেল। আমরা দুটো আলাদা ট্রেনে উঠলাম।

ট্রেন দুটো পুরোপুরি বিপরীত দুটো দিকে রওনা দিল।

১৩

কোনো কোনো দিন এমন হয় যে কোনো কারণ ছাড়াই মনটা ভালো হয়ে যায়। বেশ ফুরফুরে লাগে। হয়তো আপনি একটা গোলাপের কুঁড়ি দেখলেন বা হারিয়ে যাওয়া একটা পুরোনো টুপি খুঁজে পেলেন অথবা জামাকাপড় ঘাঁটতে গিয়ে প্রিয় একটা সোয়েটার দেখলেন, যেটা আপনি ছোটবেলায় পরতেন, আপনার মনে তখন পুরোনো একটা সুর গুনগুন করতে শুরু করবে। এক অদ্ভুত ভালো লাগার অসুখ আপনাকে পেয়ে বসবে।

সেদিন দুপুরের রোদে আপনি মাইলের পর মাইল হেঁটে যাবেন। অকারণে হাসবেন। কফি খেয়েই সন্ধ্যা পার করে দেবেন। বিয়ারের দরকার পড়বে না। জিনি পিটনির পুরোনো কোনো রেকর্ড শুনবেন। সেই ভালো লাগাটুকু পরবর্তী দুই-তিন দিন আপনাকে একেবারে আচ্ছন্ন করে রাখবে। আপনার মনে হবে, কোনো এক অন্ধকার জগৎ থেকে কিছু সুখপাখি উড়ে এসেছিল হয়তো। এরপর যে অন্ধকার থেকে এসেছিল তারা, আবার আগের মতো সেখানে ফিরে যাবে। হৃদয়ের মাঝখানে একটা শূন্যতার অনুভূতি শুধু থাকবে তখন। আমরা আমাদের হৃদয়ের মধ্যে সব সময়ই কুয়া খুঁড়তে থাকি। হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসি।

অক্টোবর মাস। রোববারের এক সন্ধ্যায় আমার হৃদয়ে সে রকম একটা কুয়া খুঁড়তে শুরু করলাম। খুঁড়তে খুঁড়তে একসময় পিনবল মেশিনটাকে চোখে পড়ল। যমজ বোনদের সঙ্গে নিয়ে আমি প্রতিদিনের মতো গলফ কোর্সে হাঁটতে বেরিয়েছিলাম সেদিন। একসময় ৮ নম্বর হোলের পাশে গিয়ে চুপচাপ বসলাম। সূর্যটা ডুবে আসছিল। সে জায়গাটায় বসে আমরা প্রায় প্রতিদিনই চুপচাপ সন্ধ্যা হওয়া দেখি। দৃশ্যটা কখনো পুরোনো হয় না আমাদের কাছে। আমরা যেখানে

বসে ছিলাম তার আশপাশে কোনো চড়াই-উতরাই নেই। একদম সরলরেখার মতো জায়গাটা, একটা এলিমেন্টারি স্কুলের লম্বা করিডরের মতো।

সাত নম্বর হোলের পাশে বসে একটা ছেলে বাঁশি বাজাচ্ছিল। ছেলেটাকে আগেও দেখেছি। এদিকেই কোথাও বাসা। সূর্য একটু একটু করে পাহাড়ের ওপারে হারিয়ে যাচ্ছে। পুরো পরিবেশটাই কী যেন একটা মায়া ছড়িয়ে দিচ্ছিল। আমি হারিয়ে গেলাম। মনের গভীরে একটা গভীর কুয়ায় ডুব মারলাম। ডুব দিয়ে পিনবল মেশিনটাকে খুঁজে পেলাম। ঠিক কী কারণে সেই অদ্ভুত জিনিসটাকে খুঁজে পেলাম বলতে পারব না। কিন্তু আমি ডুবে গেলাম।

সেই মাঠে বসে বাঁশির শব্দ শুনতে শুনতে টুকরো ছবিগুলো জোড়া দিলাম। পিনবল মেশিনের একটা আদল তৈরি হলো। এবং জিনিসটা আমার হৃদয়ে গেঁথে গেল। চোখের সামনে মেশিনটা দেখতে পেলাম যেন। ধীরে ধীরে বাকি পৃথিবী আমার সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। বাঁশির সুর আর শুনতে পেলাম না। তার বদলে পিনবল মেশিনের বাম্পারে বলের ধাক্কা লাগার শব্দ শুনলাম। মাঠের ছেঁটে রাখা ঘাসগুলো যেন হয়ে উঠল স্কোরবোর্ড। সেখানে আমি কিছু সংখ্যা দেখতে পেলাম। বলগুলো বাম্পারে ধাক্কা লাগার পর সেখানে খুব দ্রুত সংখ্যাগুলো পাল্টে যাচ্ছে। একটা পাঁচ অঙ্কের ডিজিটে গিয়ে স্কোরটা স্থির হলো। আমি সেই ডিজিটটাও পড়ে ফেললাম—৯২,৫০০।

১৯৭০ সালের পর থেকে আমি কখনো পিনবল খেলিনি। আমি আর র‍্যাট সেই বছর পুরোটা পিনবল খেলে পার করে দিয়েছিলাম। জে-র বারে আমাদের নিয়মিত আড্ডা চলত তখন। সেখানে একটা বড়সড় পিনবল মেশিন ছিল। স্পেসশিপ মডেলের। আমরা আদর করে মেশিনটাকে স্পেসশিপ নামেই ডাকতাম। সাধারণত পিনবল মেশিনে চারটা ফ্লিপার থাকে। আমাদের স্পেসশিপে ফ্লিপার ছিল তিনটা। সে সময় তিন ফ্লিপারের মেশিন খুব একটা দেখা যেত না। নিচের কেবিনেটে পার্টিশন দিয়ে দুটো ভাগ করা ছিল। দুই ভাগে দুটো ফ্লিপার। আর ওপরের কেবিনেটে ছিল বাকি একটা ফ্লিপার। বেশ পুরোনো ধরনের একটা মেশিন। প্রযুক্তি এসে খেলাটাকে পুরোপুরি যান্ত্রিক বানিয়ে দেওয়ার আগে মানুষ সে ধরনের তিন ফ্লিপারওয়ালা মেশিনে খেলত।

র‍্যাট ছিল বদ্ধ উন্মাদ। সারাটা দিন স্পেসশিপের পেছনে লেগে থাকত। র‍্যাটের একটা ছবিও আছে সেটার সঙ্গে। ছবিটা আমি তুলে দিয়েছিলাম।

আমার একটা কোডাক ক্যামেরা ছিল তখন। পকেটে রাখা যেত সেটা। র‍্যাট তার ক্যারিয়ারের সেরা স্কোর করেছিল সেদিন—৯২,৫০০। ছবিতে র‍্যাটকে স্পেসশিপে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়, স্কোরবোর্ডে ৯২,৫০০ উঠে আছে। র‍্যাট দুই আঙুলে বিজয়ের 'ভি' চিহ্ন দেখাচ্ছে। আমার কোডাক ক্যামেরাটা দিয়ে তোলা সেটাই শ্রেষ্ঠ ছবি। বলা যেতে পারে একমাত্র ছবি, যা মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারে।

ছবিতে র‍্যাটকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এক ফাইটার জেট প্লেনের পাইলটের মতো দেখাচ্ছে। আর মেশিনটাকে মনে হচ্ছে একটা পুরোনো যুদ্ধবিমান। বিমানটা খুবই পুরোনো মডেলের। হাত দিয়ে প্রপেলার ঘুরিয়ে স্টার্ট করতে হয়—সেই টাইপের। ছবিতে স্কোরবোর্ডের ৯২,৫০০ সংখ্যাটা একধরনের রূপক হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছে। সংখ্যাটা র‍্যাট এবং মেশিনের মধ্যে এমনভাবে সম্পর্ক তৈরি করেছে, মনে হচ্ছে তারা দুজন আপন মায়ের পেটের ভাই।

পিনবল কোম্পানি তাদের একজন কর্মচারীকে প্রতি সপ্তাহে একবার জে-র বারে পাঠাত। তার দায়িত্ব ছিল মেশিনটার দেখভাল করা, কারিগরি দিকগুলো চেক করে দেখা। কোনো মেরামত দরকার হলে সে মেরামত করত। আর মেশিনের ভেতরে জমা হওয়া টাকা সংগ্রহ করে অফিসে নিয়ে যেত। যে লোকটা প্রতি সপ্তাহে আসত, তার বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। খুবই কম কথা বলত সে। কারও চোখের দিকে না তাকিয়ে সরাসরি মেশিনটার কাছে চলে যেত। চাবি দিয়ে মেশিনটা খুলে ভেতরের কয়েনগুলো একটা বড় ক্যানভাসের ব্যাগে ভরে ফেলত।

সেটুকু করার পরে সে মেশিনটা টেস্ট করা শুরু করত। আবার স্টার্ট করার জন্য ভেতরে একটা কয়েন ফেলত। একটা মাত্র বল ব্যবহার করে সে সব কটি বাম্পারের চুম্বক পরীক্ষা করত, তাকে কখনোই দ্বিতীয় বল ব্যবহার করতে হতো না। একটা বল দিয়েই সে একের পর এক টার্গেট পরীক্ষা করে নিত। তার টার্গেট কখনো মিস হতে দেখিনি। এতটাই দক্ষ ছিল সে। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো পুরো কাজটাই সে করত নির্বিকার একটা চেহারা বানিয়ে। সে যে একটার পর একটা টার্গেটে হিট করছে, পুরো ব্যাপারটার মধ্যে যেন কোনো বাহাদুরি নেই।

র‍্যাট আর আমি প্রচণ্ড আগ্রহ নিয়ে তার খেলা দেখতাম। প্রচণ্ড উত্তেজনায় আমাদের নিশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে আসত। কিন্তু সে ছিল পুরোপুরি ভাবলেশহীন।

পুরো খেলাটা নিজে একবার খেলে দেখে বোনাস লাইট এবং টিল্ট লাইটগুলো পরীক্ষা করে সে জে-কে বলত, 'কোনো সমস্যা নেই, সব ঠিক আছে।' কথাটা বলে সে এক সেকেন্ডও দাঁড়াত না। চলে যেত। কাজটা করতে তার যতটা সময় লাগত তাতে আমাদের অর্ধেক সিগারেটও শেষ হতো না।

সে এত দ্রুততার সঙ্গে এবং নিখুঁতভাবে খেলাটা খেলত যে আমি আর র‍্যাট দুজন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতাম। সিগারেটে টান দেওয়ার কথা ভুলে যেতাম। ছাই জমে দীর্ঘ হয়ে যেত সিগারেটের ডগায়। সেই ছাই ঝেড়ে ফেলার কথা আমাদের মনে থাকত না। র‍্যাট বিয়ারে চুমুক দেওয়ার বদলে অবাক হয়ে লোকটার দক্ষতা দেখত।

এটা পুরোপুরি স্বপ্নের মতো একটা ব্যাপার, র‍্যাট বলত, আমি যদি ও রকম খেলতে পারতাম, তাহলে দেড় লাখ থেকে দুই লাখ স্কোর করতাম। এর কম কিছুতেই করতাম না।

এটা নিয়ে দুঃখ করো না, আমি র‍্যাটকে বোঝাতাম, লোকটা একজন প্রফেশনাল। তার কাজই পিনবল মেশিনটাকে নিয়ে। সুতরাং সে যে ভালো খেলবে এতে এত অবাক হওয়ার কিছু নেই।

ওর একটা কেনি আঙুলের নখের যোগ্যতাও আমার নেই।

বললাম তো, এটা ওর পেশা। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত দিনের পর দিন ধরে সে এই কাজটাই করে। তুমি যদি দিনের পর দিন ওর মতো পিনবল মেশিনের পেছনে লেগে থাকতে, তুমিও ওর মতো প্রতিটা টার্গেট হিট করতে পারতে।

কখনোই না। আমি কখনোই পারতাম না, র‍্যাট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলত।

র‍্যাট না পারলেও আমি পেরেছিলাম।

১৪

জে-র বারে সেদিন অনেক খদ্দের এল। অনেক দিন পর বারটা আবার আগের মতো ভরে উঠল। অধিকাংশই একেবারে নতুন কাস্টমার। অবশ্য তাতে জে-র কোনো সমস্যা নেই। তার কাছে সব কাস্টমারই কাস্টমার। নতুন-পুরোনো

দিয়ে সে কী করবে। বেচাবিক্রি নিয়ে কথা। সেটা হলেই হলো। গ্রীষ্মে যে রকম ভিড় লেগে থাকে, দোকানটায় সে রকম ভিড় হয়েছিল।

বারজুড়ে নানান ধরনের শব্দ। মানুষের হাউকাউ, কোলাহল, গ্লাসের মধ্যে বরফ ঢালার শব্দ, মানুষের হাসি, জুকবক্সে জ্যাকসন ফাইভের গান আর গ্লাসে গ্লাসে বাড়ি খাবার শব্দ। এসবের সঙ্গে যোগ হয়েছিল বারের নিজস্ব একটা পচা-বাসি গন্ধ আর সিগারেটের ধোঁয়ার সাদা মেঘ।

র‍্যাট বারের একটা কোনায় বই খুলে একা বসে ছিল। বই খুলে বসে থাকা বলতে যে রকম বোঝায়, ঠিক সে রকম না। পড়ার ভান করছিল। ভান বলাটাও বোধ হয় পুরোপুরি ঠিক হবে না। আসলে বইয়ের একটা পাতাই সে বারবার পড়ছিল। পাতা ওল্টানো হয়নি। বারে বসে একা একা বিয়ার খাওয়ার মধ্যে একটা খুব মন খারাপ করা ব্যাপার আছে। তাই সে একটা কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকার অভিনয় করে যাচ্ছিল। তার ইচ্ছা ছিল কোনোমতে বিয়ারটা শেষ করে অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে মরার মতো একটা ঘুম দেবে। একটা পর্যায়ে গিয়ে সে হাল ছেড়ে দিল এবং বইটা বন্ধ করে পাশে রাখল।

এক সপ্তাহ ধরে র‍্যাটের মনে হচ্ছিল, তার কেউ নেই। সে পৃথিবীতে একা। সবাই তাকে ছেড়ে চলে গেছে। শুধু মানুষ না, পৃথিবীর সবকিছু তার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। এমনকি ভাগ্যদেবী পর্যন্ত তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এই এক সপ্তাহ সে ক্রমাগত বিয়ার আর সিগারেট খেয়েছে। ঘুমানোর সময় বিড়ালের মতো মটকা মেরে ঘুমিয়েছে। এমনকি এই সময়ের মধ্যে আবহাওয়াটাও কেমন যেন অন্য রকম আচরণ করতে শুরু করেছে। প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছে এই কদিন। বৃষ্টির পানি পাহাড় থেকে মাটি ধুয়ে নিয়ে গিয়ে নদীতে ফেলেছে। সেই নদী গিয়ে সমুদ্রে মিশেছে। সমুদ্রের পানি হয়ে উঠেছে ঘোলা। সেই ঘোলা পানির দিকে তাকালে মন খারাপ হতে বাধ্য। বিষণ্ন একটা দৃশ্য।

তার সপ্তাহজুড়ে মনে হয়েছে, সে এক বান্ডিল পুরোনো খবরের কাগজে মাথা ঠেকিয়ে ঝিমোচ্ছে। ঘুম হয়েছে। তবে পাতলা এবং খুবই অল্প সময়ের জন্য। তার মনে হচ্ছিল সে দাঁতের সমস্যায় ভুগছে। এবং একটা ডেন্টিস্টের ওয়েটিং রুমে বসে আছে। ওয়েটিং রুমে প্রচণ্ড গরম। সেই গরমের মধ্যে দাঁতের ব্যথা ভুলে থাকার জন্য সে চেয়ারে বসে ঘুমানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর পর কেউ একজন ওয়েটিং রুমের দরজাটা খুলছে এবং বেরিয়ে যাচ্ছে। সেই শব্দে বারবার তার ঘুম ভেঙে যাচ্ছে এবং সে ঘড়ি দেখছে।

সপ্তাহের অর্ধেকটা সে হুইস্কির মধ্যে ডুবে ছিল। এই সময় শুধু হুইস্কি খেয়েছে। পুরো সময়টায় সে কোনো কিছু নিয়ে ভাববে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু নানান আজেবাজে ভাবনা এল তার মনে। সপ্তাহের মাঝামাঝি গিয়ে তার নিজেকে একটা মেরু ভালুকের মতো মনে হলো। একটা মেরু ভালুক বরফের চাঁই পরীক্ষা করে দেখে যে সে সেটা পার হতে পারবে কি পারবে না। ফুটো বের করার চেষ্টা করে। র‍্যাটও খুব সতর্কতার সঙ্গে তার চিন্তাভাবনাগুলোর ফুটো পরীক্ষা করল। যখন বুঝতে পারল যে ফুটো আছে এবং সেই ফুটো গলে হয়তোবা সামনের দিকে যাওয়া সম্ভব, সে তখন ঘুমোতে গেল। যখন জেগে উঠল, তখন সবকিছু আগের মতোই ছিল। কিছুই বদলায়নি। মাথাব্যথাটা শুধু একটু কমেছে।

মাথাব্যথা কমার পর র‍্যাট আবার তার পুরোনো রুটিনে ফিরে গেল। হুইস্কি ছেড়ে বিয়ার ধরল। র‍্যাট শূন্য চোখে তার সামনে রাখা ছয়টা বিয়ারের বোতলের দিকে তাকাল। বোতলগুলোকে সে সুন্দর করে পরপর সাজাল। সব কটি বোতল খালি। বোতলগুলোর ফাঁক দিয়ে কাউন্টারের পেছনে জে-কে দেখা যাচ্ছে।

র‍্যাট ভাবল, তার বয়স যখন আঠারো বছর, তখন থেকেই নিয়মিত জে-র বারে বসে সে বিয়ার খায়। কত হাজার বোতল সে খেয়েছে এই পর্যন্ত? কত হাজার আলু তার জন্য কাটা হয়েছে, যেন সে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই খেতে পারে? জুকবক্সে কত হাজার কয়েন সে ফেলেছে গান শুনবে বলে? ঢেউ এসে নৌকায় বাড়ি খেয়ে যেমন চলে যায়, জিনিসগুলো তার জীবনে এসেছে, আবার চলে গেছে। র‍্যাট নিজেকেই প্রশ্ন করল, আমি কি এক জীবনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে বিয়ার খাইনি? প্রশ্নটা করার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর পেয়ে গেল। সে যথেষ্ট খেয়েছে এবং হয়তোবা বাকি যত দিন বেঁচে আছে, তত দিন খাবে। কিন্তু জে-র বারে বসে বিয়ার খেতে যে অনুভূতি হয়, তা অন্য কোথাও হয় না।

তার বয়স এখন পঁচিশ। এই বয়সে অধিকাংশ দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন মানুষই তাদের পড়াশোনা শেষ করে এবং চাকরিবাকরি শুরু করে। অথচ সে মোটামুটিভাবে বিয়ার খাওয়াটাই জীবনের মূল উদ্দেশ্য হিসেবে নিয়ে বসে আছে। এ কথাটা ভাবতে ভাবতেই র‍্যাট সপ্তম বোতলটা খালি করে বাকি ছয়টা বোতলের পাশে দাঁড় করাল। গুনে দেখল আরেকবার। গ্লাসের অবশিষ্ট বিয়ারটুকু এক চুমুকে শেষ করে তার ভেজা হাতটা প্যান্টে মুছে নিল।

সে নিজেকে বোঝাল যে পুরো ব্যাপারটা নিয়ে তাকে গোড়া থেকে ভাবতে

হবে। পালালে চলবে না, তাকে কিছু প্রশ্নের সামনে দাঁড়াতে হবে। সে নিজের ভেতরটাকে দুটো ভাগ করে ফেলল। এক ভাগ প্রশ্ন করবে। আরেক ভাগ উত্তর দেবে।

ভাগ করে ফেলা নিজের একটা অংশ অন্য অংশকে প্রশ্ন করল, তোমার বয়স এখন ২৫। দুটো ১২ বছরের ছেলের বয়স যোগ করলে যে বয়স হয়, তোমার বয়স তার থেকেও বেশি। এখন তুমি বলো তো, তোমার জীবনের মূল্য কি তাদের থেকে বেশি? তুমি কি এমন কিছু করতে পেরেছ, যে কাজটা করে তোমার জীবনটা অর্থবহ কিছু একটা হয়ে উঠেছে?

অন্য অংশ উত্তর দিল, দুটো ছেলের সঙ্গে তুলনার প্রশ্নই ওঠে না। সম্ভবত আমার জীবনের মূল্য ওই ১২ বছর বয়সী যেকোনো একটা ছেলের থেকেও কম। আমার কোনো অর্জন নেই।

আচ্ছা ঠিক আছে, ধরো আচারের বয়ামে একটা পিঁপড়া হেঁটে বেড়াচ্ছে। তুমি কি মনে করো, ওই পিঁপড়া থেকে তোমার জীবনের মূল্য বেশি?

আচারের বয়াম! এর মধ্যে আচারের বয়াম আর পিঁপড়া কোথা থেকে এল? তোমার এসব বোকা বোকা মেটাফর নিয়ে তুমি মরো না কেন?

আচ্ছা ঠিক আছে। তুমি রেগে যাচ্ছ বুঝতে পেরেছি। মাথাটা একটু ঠান্ডা করো। আমার অন্য একটা প্রশ্নের জবাব দাও। তুমি তো নিজে বুঝতে পারছ যে তোমার সবকিছু ঠিকঠাক চলছে না। কিছু একটা ঘাপলা আছে। এ কারণেই তুমি আমাকে ডেকে এনেছ। আমাকে দিয়ে প্রশ্নগুলো তুমি করাচ্ছ। তুমি বলো, তোমার জীবনে ভুলটা কোথায় ছিল?

আমি বলতে পারব না। কী ভুল সেটা তো জানিই না, কোথায় গিয়ে খুঁজতে হবে সেটাও আমার জানা নেই।

র‍্যাটের মাথা ধরে গেল। প্রশ্নোত্তর খেলা বাদ দিয়ে কাউন্টারে আরেক বোতল বিয়ারের অর্ডার করল।

জে তার দিকে ৮ নম্বর বিয়ারের বোতলটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, তুমি আজ একটু বেশি খাচ্ছ।

বিয়ারে চুমুক দিয়ে র‍্যাটের মাথাটা ব্যথা করে উঠল। তার পুরো শরীর নৌকার মতো দুলছে। মনে হচ্ছে, সে একবার ঢেউয়ে ভেসে উঠছে, আবার পরক্ষণেই ডুবে যাচ্ছে। তার চোখগুলো ভারী হয়ে আসছিল। ভেতরের একটা কণ্ঠ বলে উঠল, বমি করে ফেলো। সবকিছু উগরে দাও।

র‍্যাট টলোমলো পায়ে উঠে দাঁড়াল। কোনোমতে হেলতে-দুলতে বাথরুম পর্যন্ত পৌছাল। একটা মেয়ে সেখানে আয়নাতে নিজের ভ্রু ঠিক করছিল। র‍্যাট তাকে একপ্রকার ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বমি করে বাথরুম ভাসিয়ে ফেলল।

বহু বছর পরে র‍্যাট বমি করল। নিজেই মনে করতে পারল না, শেষবার কবে বমি করেছে এ রকম। কমোডে বসে পায়ের ওপর পা তুলে একটা সিগারেট ধরাল। সিগারেট শেষ করে মুখে পানি দিল। হাতটা সাবান দিয়ে ভালো করে ধুয়ে চুলে খানিকটা পানি ছিটাল। চুলগুলো এলোমেলো হয়েছিল। সেগুলো কিছুটা সোজা করে নিল আঁচড়ানোর ভঙ্গিতে। মুখ কিছুটা শুকনো দেখাচ্ছে এখনো। কিন্তু সবকিছু মিলিয়ে খুব একটা খারাপ দেখাচ্ছে না। একটা নিষ্পাপ ভদ্র ছেলের মতো দেখাচ্ছে। সে যখন জুনিয়র হাইস্কুলে পড়ত, তার সেই সময়কার চেহারাটা চোখে ভেসে উঠল। স্কুলের শিক্ষকেরা তাকে খুব পছন্দ করত। আয়নায় নিজের সেই পুরোনো নিষ্পাপ চেহারাটা খুঁজে পেল।

টয়লেট থেকে বেরিয়ে র‍্যাট বারে সেই মেয়েটাকে খুঁজতে শুরু করল যাকে টয়লেট থেকে বের করে দিয়েছিল। খুঁজে পেয়ে তার কাছে গিয়ে মাফ চাইল। নিজের সিটে গিয়ে গ্লাসে ঢালা বিয়ারটুকু এক চুমুকে শেষ করল। জে তার দিকে ঠান্ডা এক গ্লাস পানি বাড়িয়ে দিতেই সেটাও ঢকঢক করে খেয়ে ফেলল। দু-তিনবার মাথা নেড়ে একটা সিগারেট ধরাল। মনে হলো মাথাটা আবার কাজ করতে শুরু করেছে।

সে ঠিক করল, আজ রাতেই সবকিছুর মীমাংসা করবে। সব প্রশ্নের উত্তর আজ রাতেই সে খুঁজে বের করবে। রাতটা যথেষ্ট বড়, প্রশ্নের উত্তরগুলো খুঁজে পাওয়ার জন্য প্রায় অসীম একটা সময় তার হাতে আছে।

১৫

১৯৭০ সাল। পুরোটা বছর আমি পিনবলের ঘোরে ডুবে ছিলাম। এক অমোঘ নিয়তির মতো মেশিনটা যেন আমাকে পেছন থেকে টেনে ধরেছিল। পৃথিবীর অন্য কোনো জিনিসের প্রতি আমার কোনো আকর্ষণ ছিল না সে সময়। মাঠের ভেতর যেন আমার নিজের সাইজের একটা গর্ত খুঁড়েছিলাম সে বছর। সেই

গর্তে ঢুকে সারা দিন মাটি চাপা দিয়ে বসে থাকতাম। বাইরের কোনো শব্দ যেন না আসে, সে জন্য কানে তুলো চেপে ছিলাম। সন্ধ্যাবেলায় আমি সে গর্ত থেকে বাইরে বের হতাম। শরীরে কোটটা চাপিয়ে সোজা গিয়ে শিনজুকুর একটা আর্কেড গেম সেন্টারে হাজির হতাম।

তত দিনে আমার ছুটি শেষ। আমি টোকিওতে চলে এসেছি। জে-র বারে যে রকম একটা তিন ফ্লিপারের স্পেসশিপ ছিল, টোকিওর শিনজুকুতে আমি সেই মডেলের একটা পিনবল মেশিন আবিষ্কার করেছিলাম। প্রতিদিন সন্ধ্যায় সেই গেম সেন্টারে চলে যেতাম।

ভেতরে কয়েন ফেলে প্লে-বাটনে চাপ দিতেই ঘুমন্ত মেশিনটা জেগে উঠত। মৃদু গুঞ্জন তুলে সেটা কাঁপতে শুরু করত। দশটা টার্গেট নির্দিষ্ট করা থাকত। বোনাস লাইটগুলো জ্বলে ওঠে আবার নিভে যেত, ছয় ডিজিটের স্কোরবোর্ড রিসেট হয়ে শূন্যে এসে থামত। প্রথম বলটা মেশিনের লাইনের মধ্য দিয়ে ঘুরতে শুরু করত। ওই মেশিনের মধ্যে আমি প্রতিদিন অসংখ্য কয়েন ফেলেছি। এভাবেই এক শীতের সন্ধ্যায় আমি ছয় অঙ্কের ম্যাজিক ফিগার স্কোর করলাম।

দিনটার কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। সন্ধ্যা থেকেই বৃষ্টি পড়ছিল খুব। স্কোরবোর্ডে ছয় অঙ্কের ডিজিট দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত শরীর কাঁপতে শুরু করল। কোনোমতে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালাম। ঠান্ডা বিয়ারে একটা চুমুক দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে সেদিন স্কোরবোর্ডের ছয় অঙ্কের সংখ্যাটার দিকে তাকিয়ে ছিলাম—১০৫,২২০।

মুহূর্তটাকে বলা যেতে পারে আমার ম্যাজিক মোমেন্ট, ভালোবাসার শুরু। আমি স্পেসশিপের প্রেমে পড়ে গেলাম। কলেজে যাওয়ার মতো ফালতু কাজ পুরোপুরি বাদ দিয়ে দিলাম। পার্টটাইম একটা জব করতাম তখন। নতুন প্রেমে পড়া ছেলেদের মতো বেতনের পুরো টাকাটাই প্রেমিকার পেছনে খরচ হয়ে যেত। টাকা ঢালতে ঢালতেই সব টেকনিকে মোটামুটি দক্ষ হয়ে উঠলাম। হাগিং, পাসিং, ট্রাপিং, স্টপশট—সব টেকনিকই একটু একটু করে আমি শিখে গেলাম। আমি যখন খেলতাম, চারদিকে বিভিন্ন বয়সী দর্শক জমে যেত। খুব দ্রুত আমি লোকাল হিরো হয়ে উঠলাম। হাইস্কুলের একটা মেয়ে নিয়মিত গাঢ় লাল লিপস্টিক ঠোঁটে মেখে আমার পাশে দাঁড়িয়ে আমাকে উৎসাহ দিত। একবার তো সে আমার বাহুতে তার নরম স্তন পর্যন্ত ঘষে দিল।

শীতের মাঝামাঝি গিয়ে আমার স্কোর দেড় লাখ পার হয়ে গেল। তীব্র

শীতে জমে গিয়ে তখন কেউ সেই গেম সেন্টারে আসত না। গলায় মাফলার বেঁধে গায়ে একটা ভারী ডাফেল কোট চাপিয়ে প্রতিদিন সন্ধ্যায় এসে একা বসে থাকতাম। মেশিনটার সঙ্গে আঠার মতো লেগে রইলাম। টানা খেলে যেতাম একটার পর একটা গেম। প্রতি তিন গেম পর একটা করে ছোট বিরতি নিতাম। দেয়ালে হেলান দিয়ে একটা বিয়ার খেতাম। আমার পায়ের দুপাশে সিগারেটের টুকরোর একটা পাহাড় জমে যেত।

তিন ফ্লিপারের স্পেসশিপটার সঙ্গে আমার গভীর একটা সম্পর্ক গড়ে উঠল। আমাদের মধ্যে কোনো ধরনের ভুল বোঝাবুঝি ছিল না। সে যেমন আমাকে বুঝত, আমিও তাকে পুরোপুরি বুঝতে পারতাম। প্রতিবার যখন আমি প্লে-বাটনে চাপ দিতাম, সে মৃদু গুঞ্জন করে উঠত। স্কোরবোর্ড রিসেট হয়ে খেলা শুরু হতো। আমি মেশিনটার সঙ্গে কথা বলতাম। স্কোর ভালো না হলে আমার যখন মন খারাপ হতো, মেশিনটা আমাকে বলত, এতে তোমার কী দোষ?

আমি তখন মাথা নাড়তাম।

সে আবারও বলত, যতটুকু চেষ্টা করা যায়, ততটুকু তুমি করেছ। তাই না?

আমি বলতাম, না। আমার পক্ষে আরও অনেক ভালো খেলা সম্ভব ছিল। ৯ নম্বর টার্গেটে আমি খুব সহজেই হিট করতে পারতাম। কিন্তু ওটার ধারেকাছেও যেতে পারিনি। ছোট্ট একটা কাজও আমি ঠিকভাবে করতে পারি না।

একটা মানুষের পক্ষে এর থেকে বেশি করা সম্ভব না।

সেটা তোমার মনে হতে পারে। কিন্তু আমার ধারণা সম্ভব। শুধু আমিই পারছি না।

ফেব্রুয়ারির শুরুতে মেশিনটা একেবারে উধাও হয়ে গেল। শুধু মেশিন না, পুরো গেম সেন্টারটাই বন্ধ হয়ে গেল। আমি কয়েকবার গিয়ে ঘুরে এলাম। কিন্তু বন্ধ শাটার খুলল না।

কয়েক দিন পর সেই জায়গায় একটা খাবারের দোকান বসে গেল। তারা সারা রাত ডোনাট বিক্রি করত। গিংহ্যাম ইউনিফর্ম পরা কম বয়সী সুন্দরী মেয়েরা প্লেটে শুকনো ডোনাট সার্ভ করত। দোকানটার সামনে হাইস্কুলের ছেলেদের মোটরবাইকের লাইন লেগে যেত। একদিন সেখানে গিয়ে একটা টেবিলে বসলাম। একটা ডোনাট আর কফি অর্ডার করে ওদের কাছ থেকে

গেম সেন্টারটা কেন উঠে গেল সেটা বের করার চেষ্টা করলাম।

যার কাছে জানতে চেয়েছি সে আমার দিকে খুবই সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাল।

গেম সেন্টার? সে বলল।

হ্যাঁ, আমি মাথা নাড়লাম।

কোন গেম সেন্টার?

তোমাদের এই খাবারের দোকানটা দেওয়ার আগে যেটা ছিল।

আমার কোনো ধারণা নেই সে ব্যাপারে।

মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। আমি ফুটপাত ধরে একা একা কিছুক্ষণ হাঁটলাম। কেউ আমাকে বলতে পারল না, তিন ফ্লিপারের স্পেসশিপটা কোথায় হারিয়ে গেছে।

এমন নয় যে পৃথিবীতে ওই একটা মাত্র পিনবল মেশিন ছিল। ইচ্ছে করলে অন্য কোথাও গিয়েও আমি খেলতে পারতাম। কিন্তু স্পেসশিপটাকে আমি ভালোবেসে ফেলেছিলাম। তার সঙ্গে আমার একধরনের বোঝাপড়া তৈরি হয়েছিল। এরপর আমি অন্য কোনো মেশিনকে ভালোবাসতে পারিনি।

আমি পিনবল খেলা পুরোপুরি ছেড়ে দিলাম।

১৬

কয়েক দিন ধরে টানা বৃষ্টি হলো। থামার কোনো লক্ষণ নেই। পুরো শহর যেন পানিতে ডুবে গেল। শুক্রবার সন্ধ্যায় কোনো পূর্বঘোষণা ছাড়াই বৃষ্টি থামল হঠাৎ করে। তখন সন্ধ্যা। মেঘের ফাঁক গলে বিদায়ী সূর্যের আলো র‍্যাটের বারান্দায় এসে পড়ল। সেই রহস্যময় আলোর দিকে তাকিয়ে র‍্যাটের মনটা যেন কেমন করে উঠল।

টি-শার্টের ওপর একটা উইন্ডব্রেকার চাপিয়ে সে বাসার বাইরে বের হলো। পুরো ফুটপাতে পানি জমে আছে। যত দূর চোখ যায় শুধু পানি। একটু একটু করে কুয়াশা বাড়ছে। বাতাসে বৃষ্টির গন্ধ। ঝুপ করে নগরের বুকে অন্ধকার নেমে এল। গাড়ির জানালায় কনুই ঠেকিয়ে শহরজুড়ে ধীরে ধীরে গাড়িটা চালাল র‍্যাট।

সাদা কুয়াশা একটু একটু করে পশ্চিমের পাহাড়ের দিকে সরে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ এলোমেলোভাবে গাড়িটা চালিয়ে নদীর পাড়ের রাস্তা ধরে সোজা সমুদ্রের দিকে গেল সে। মেয়েটার অ্যাপার্টমেন্টের উল্টো দিকে পার্ক করল। ঘড়িতে তখন সাতটা বেজে পনেরো মিনিট। এমন একটা সময় যখন অধিকাংশ মানুষেরই ডিনার শেষ। তারা সোফায় গা এলিয়ে বসে আরাম করে টিভি দেখছে।

মেয়েটার বাসার কাছে এসে র‍্যাট প্রায়ই একটা খেলা খেলে। সে আবারও তার প্রিয় সেই খেলা খেলতে শুরু করল। মাথার পেছনে হাত রেখে সিটে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করল। কল্পনায় মেয়েটার অ্যাপার্টমেন্টের ছবি দেখতে চাইল। সে এ পর্যন্ত মাত্র দুবার গেছে সেখানে। তাই পরিষ্কার কোনো ছবি মাথায় এল না। তবে মোটামুটি এটুকু মনে আছে যে দরজা দিয়ে ঢুকলেই কিচেন চোখে পড়বে। দশ ফুট বাই দশ ফুট সাইজের ঘর সেটা। একটা ছোটখাটো খাবার টেবিল আছে মাঝখানে। টেবিল ক্লথের রং কমলা, ফুল লতা ছাপওয়ালা কাপড়। চারটা চেয়ার চারদিকে। অরেঞ্জ জুস, একটা খবরের কাগজ আর স্টেইনলেস স্টিলের টি-পট টেবিলে রাখা।

এরপর একটা বড় রুম। আসলে সেটা আগে ছোট ছোট দুটো রুম ছিল। সম্ভবত মেয়েটা এই অ্যাপার্টমেন্টে ওঠার পর মাঝখানের পার্টিশনটা তুলে দেয়। দুটো রুম এক করে ফেলায় সেটা সাইজে বেশ বড়। সেখানে ঢুকলে প্রথমেই চোখে পড়ে একটা লম্বা ডেস্ক। ডেস্কের ওপরে কাচ লাগানো। তার ওপর তিনটা বিয়ারের মগ। মগের ভেতরে নানা ধরনের জিনিস রাখা। পেনসিল, রুলার, বিভিন্ন ধরনের কলম। এ ছাড়া টেবিলজুড়ে আরও অনেক কিছু আছে। ইরেজার, ইঙ্ক-রিমুভার, পেপার ওয়েট, স্কচটেপ, বিভিন্ন রঙের পেপার ক্লিপ, ডাকটিকিট।

একটা টেবিল ল্যাম্পও আছে সেখানে। ডেস্কের পাশে দেয়ালের সঙ্গে একটা ড্রয়িং বোর্ড খাড়া করে রাখা। দেখলেই বোঝা যায় বোর্ডটা প্রায়ই ব্যবহার করা হয়।

বাতাসে কুয়াশা আরও ঘন হচ্ছিল। পুরো এলাকায় গভীর অন্ধকার। অনেকখানি সময় পরপর দু-একটা গাড়ি র‍্যাটের গাড়িটাকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। গাড়িগুলোর হলুদ ফগলাইটে মাঝেমধ্যে সে রাস্তাটা দেখতে পাচ্ছে। জানালা দিয়ে মিহি কুয়াশা ঢুকে গাড়ির সবকিছু প্রায় ভিজিয়ে দিল—গাড়ির সিট, উইন্ডশিল্ড, শরীরে চাপানো উইন্ডব্রেকার, সিগারেটের

প্যাকেট—সবাকছু।

র‍্যাট মনে করার চেষ্টা করল, রুমটাতে আর কী কী আছে। একটা বই রাখার শেলফ, গান শোনার জন্য একটা পোর্টেবল স্টেরিও সেট, কাপড় রাখার জন্য চেস্ট অব ড্রয়ার। বইয়ের শেলফে অনেকগুলো বই সুন্দর করে সাজানো। অধিকাংশই কাজের বই, স্থাপত্যবিদ্যার ওপরে। এ ছাড়া কিছু ভ্রমণবিষয়ক বই আছে। কিছু ম্যাপ, অল্প কিছু জনপ্রিয় উপন্যাস, মোজার্টের জীবনকাহিনি নিয়ে একটা বই, অনেকগুলো অভিধান। তার মধ্যে ফ্রেঞ্চ অভিধানটা খুলেছিল সে। প্রথম পাতায় গোটা গোটা হাতের লেখায় কিছু নোট নেওয়া। বোঝা যায়, একটা সময় বইটা প্রচুর ব্যবহার করা হয়েছে। স্টেরিওতে বাজানোর জন্য কিছু রেকর্ডও আছে সেখানে। অধিকাংশ রেকর্ডই বাখ, হেইডেন অথবা মোজার্টের।

এরপর র‍্যাট একেবারে হারিয়ে গেল। সে কিছু একটা মনে করার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। তবে এটা বুঝতে পারল যে ভুলে যাওয়া জিনিসটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। ওটা ছাড়া রুমটা পূর্ণ হবে না। কী জিনিসটা? চোখ দুটো বন্ধ করে সে গভীরভাবে ভাবল। অবশেষে তার মনে পড়ল। রুমের আলো এবং কার্পেট। কিন্তু কী রকম আলো আর কী রঙের কার্পেট? অনেক চেষ্টা করেও মনে করতে পারল না সে।

র‍্যাটের মনে হলো, গাড়ি থেকে নেমে এক দৌড়ে গিয়ে মেয়েটার বাসায় ঢুকে জিনিসগুলো দেখে আসবে। সে সত্যি সত্যি নামতে যাচ্ছিল। তখনই নিজেকে আটকাল। 'ইডিয়ট' বলে গালি দিল নিজেকে। ঠান্ডা মাথায় গাড়ির সিটে আবার শরীরটা এলিয়ে দিয়ে দূরে অন্ধকার সাগরের দিকে তাকাল। কুয়াশার জন্য কিছুই দেখতে পেল না। তার সামনে দুধ সাদা রঙের একটা কুয়াশা পুরো সাগরটাকে চাদরের মতো আঁকড়ে ধরে রেখেছে। একটা জিনিসই শুধু মাঝেমধ্যে দেখা যাচ্ছে। বাতিঘরের কমলা রঙের আলো। একবার জ্বলছে, আবার নিভছে, আবার জ্বলছে। একটা নির্দিষ্ট ছন্দে, অনেকটা হৃৎস্পন্দনের মতো।

মেয়েটার অ্যাপার্টমেন্টের বাতি একটা একটা করে নিভতে শুরু করল এবং একসময় অন্ধকার হয়ে গেল। র‍্যাট গাড়ির ছাদের দিকে একটাবার তাকাল। তারপর চোখ বন্ধ করে ফেলল। মনে হলো, সে কোনো একটা সুইচে চাপ দিচ্ছে। তার মাথার ভেতরের বাতিগুলো একটা একটা করে অফ করে দিল সে। একটা সময় মাথাজুড়ে গভীর অন্ধকার নেমে এল।

১৭

অফিসের ডেস্কে বসে আমি তিন ফ্লিপার স্পেসশিপের কণ্ঠ শুনতে পেলাম। সে আমাকে ডাকছে। আমি চোখ বন্ধ করলাম। এবং নিশ্চিতভাবেই সেই ডাক শুনতে পেলাম।

সেদিন আমার টেবিলে অনেক কাজ জমে গিয়েছিল। গাধার মতো নাক-মুখ গুঁজে কাজে ডুবে ছিলাম। লাঞ্চ ব্রেক পর্যন্ত নিইনি। আবিসিনিয়ান বিড়াল দুটোর সঙ্গেও খেলা হয়নি। কারও সঙ্গে কথা বলিনি। অফিস সেক্রেটারি মেয়েটা মাঝেমধ্যে আমার কাছে এসেছে অবশ্য। কথা বলার পাঁয়তারা করেছে। কাজের মধ্যে ডুবে আছি দেখে শেষ পর্যন্ত মাথা নেড়ে চলে গেছে। দুপুর দুটোর মধ্যে আমার পুরো দিনের কাজ মোটামুটি শেষ হয়ে গেল। হালকা তন্দ্রামতো এল। চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করতেই স্পেসশিপের কণ্ঠ শুনতে পেলাম। চোখ মেলে পাণ্ডুলিপিগুলো আরেকবার ক্রসচেক করলাম। দুপুর তিনটার দিকে সেগুলো নিয়ে মেয়েটার ডেস্কে জমা দিয়ে সোজা বেরিয়ে গেলাম অফিস থেকে।

আমার গন্তব্য ছিল টোকিওর কোনো একটা আর্কেড গেম সেন্টার। হারিয়ে যাওয়া তিন ফ্লিপারের কোনো একটা স্পেসশিপ খুঁজে বের করতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু আমার পুরো চেষ্টাই মাঠে মারা গেল। কেউ জীবনে এ ধরনের কোনো পিনবলের মেশিনের নামও শোনেনি। যার কাছেই জিজ্ঞাসা করলাম, সে আমার দিকে এমনভাবে তাকাল যেন আমিই স্পেসশিপে করে এসেছি ভিনগ্রহ থেকে।

একটা গেম সেন্টারের মালিক রীতিমতো ব্যঙ্গ করে বলল, আমাদের এই মাটির পৃথিবীতে যে সমস্ত চার ফ্লিপারের মেশিন আছে, সেগুলো দিয়ে আপনার কাজ চলবে না?

না চলবে না, বললাম আমি।

আমাদের মেশিনটা কিন্তু একদম নতুন আনা। নতুন মেশিনটা সবাই খুব পছন্দ করছে। ট্রাই করে দেখতে পারেন। ওটার নাম আন্ডারগ্রাউন্ড এক্সপ্লোরার।

কিন্তু আমার আন্ডারগ্রাউন্ড এক্সপ্লোরার চাই না। আমার চাই তিন ফ্লিপারের স্পেসশিপ।

তাকে প্রথমে হতাশ মনে হলেও সে বোধ হয় শেষমেশ আমার প্রতি একটু সহানুভূতি বোধ করল।

আপনি বরং এক কাজ করুন, সে বলল, আপনি যে রকম চাচ্ছেন সে রকম পিনবল মেশিন নেই এখানে। সম্ভবত পুরো শহরে কোথাও খুঁজে পাবেন না। তবে অন্য একটা মেশিন আছে, সেটাতেও তিনটা ফ্লিপার। খেলাটাও সহজ। মেশিনটার নাম সাউথ-পো। ওটায় একবার ট্রাই করবেন নাকি? তিন ফ্লিপার নিয়ে কথা। ওটাতে বেশ কিছু বোনাস বল পাওয়ার সুযোগ আছে।

আমি খুবই দুঃখিত, বললাম আমি, কিন্তু আমি আসলে স্পেসশিপ মেশিনটা খুঁজছিলাম।

লোকটা কোনো এক অদ্ভুত কারণে আমার ওপর বিরক্ত হলো না। বরং খুঁজে পেতে এক লোকের ফোন নম্বর দিল।

এই নম্বরে ফোন করে দেখতে পারেন, সে বলল, লোকটা পিনবলের ব্যাপারে মোটামুটি সব খবরই রাখে। কেউ যদি আপনাকে আপনার স্পেসশিপের খবর দিতে পারে তো এই লোক পারবে। তাকে আপনি মোটামুটি পিনবলের একধরনের বিশ্বকোষ বলতে পারেন। যদিও সে খুবই অদ্ভুত এক লোক।

আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, আমি বললাম।

ধন্যবাদ দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। আশা করি আপনি জিনিসটা খুঁজে পাবেন।

পাশের এক কফিশপে গিয়ে নম্বর দেখে ফোন করলাম। পাঁচবার রিং বাজার পর এক ভদ্রলোক ফোন ধরলেন। তার গলার স্বর খুবই মোলায়েম, মাখনের মতো। মনে হলো, আমি এনএইচকে টেলিভিশনে সন্ধ্যা সাতটার খবর শুনছি। যদিও টিভির খবরের পেছনে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক হিসেবে একটা বাচ্চার কান্নার শব্দ ছিল, যেটা বেশ বেমানান। আমি লোকটাকে নিজের নাম বলে কথা শুরু করলাম।

আসলে আমি একটা নির্দিষ্ট মডেলের পিনবল মেশিনের খোঁজ করছিলাম, বললাম আমি।

ওই প্রান্তের ভদ্রলোক কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন।

কী ধরনের মেশিন? তিনি জানতে চাইলেন।

তিন ফ্লিপারের স্পেসশিপ।

ওপাশের ফোনটা আবারও কিছুক্ষণের নীরব হয়ে গেল।

আমি তাকে সাহায্য করার জন্য বললাম, মেশিনটার গায়ে কয়েকটা গ্রহ আর একটা রকেটের ছবি আঁকা আছে।

আমি বুঝতে পেরেছি, তিনি বললেন, আপনি যে মেশিনটার কথা বলছেন সেই মেশিনটা আমেরিকা থেকে এসেছিল। শিকাগোর একটা কোম্পানি ১৯৬৮ সালে ওটা বাজারে ছাড়ে। কোম্পানিটার নাম গিলবার্ট অ্যান্ড স্যান্ডস।

তার গলার স্বর শুনে মনে হচ্ছিল কোনো ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ছাত্রদের ক্লাস নিচ্ছেন।

অনেকেই মেশিনটাকে বলত 'দুর্ভাগ্যের মেশিন', তিনি বললেন।

দুর্ভাগ্যের মেশিন? আমি অবাক হয়ে জানতে চাইলাম।

ফোনে ফোনে তো বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব না। আপনি বরং একদিন আমার সঙ্গে দেখা করেন। মেশিনটার ব্যাপারে সব কথা বলতে গেলে সময় লাগবে।

পরের দিন সন্ধ্যায় একটা রেস্টুরেন্টে আমরা মিটিং ফিক্স করলাম।

দেখা হওয়ার পর প্রথমেই আমরা দুজন নিজেদের বিজনেস কার্ড বিনিময় করে নিলাম। তার বিজনেস কার্ডে চোখ রেখে চমকে গেলাম। ভদ্রলোক আসলেই একটা ইউনিভার্সিটিতে পড়ান। বয়স তিরিশের আশপাশে হবে। এর মধ্যেই মাথার চুল পড়তে শুরু করেছে। কিন্তু শরীরের চামড়া সূর্যের আলোতে চমৎকারভাবে ট্যান করা। স্বাস্থ্য দেখে মনে হয় নিয়মিত ব্যায়াম করছেন। বেশ হ্যান্ডসামই বলা চলে।

আমি স্প্যানিশ পড়াই, তিনি বললেন, জাপানে স্প্যানিশ পড়ানো আর মরুভূমিতে পানি ছিটানো একই ব্যাপার।

আমি মাথা নাড়লাম।

আপনারা যে অনুবাদের কাজ করেন, সেখানে স্প্যানিশ প্রয়োজন হয় না? তিনি জানতে চাইলেন।

না, আমি বললাম, আসলে আমাদের কোম্পানিটা খুব ছোট। অধিকাংশ কাজই ইংরেজির। আমি ইংরেজি অনুবাদগুলো করি। মাঝেমধ্যে অবশ্য ফ্রেঞ্চ ভাষার কিছু কাজ করতে হয়। সেগুলোর দায়িত্ব আমার এক বন্ধুর। সে ফ্রেঞ্চ জানে।

তিনি এমনভাবে মাথা নাড়লেন, মনে হলো আমাদের অফিসের স্প্যানিশ অনুবাদের কাজ করতে পারবেন না বলে খুব আফসোস হচ্ছে। তবে তার

চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছিল পুরোটাই দুষ্টুমি। টাইয়ের নটটা আলগা করে তিনি আমার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকালেন।

কখনো স্পেন গিয়েছেন? তিনি জানতে চাইলেন।

সে সৌভাগ্য আমার হয়নি, বললাম আমি।

কফি চলে এল। আমরা নিঃশব্দে কফিতে চুমুক দিলাম। স্পেন-সংক্রান্ত কথাবার্তা সেখানেই থেমে গেল।

কফিতে চুমুক দিয়ে তিনি মূল প্রসঙ্গে চলে এলেন। গলা খাঁকারি দিয়ে শুরু করলেন, 'গিলবার্ট অ্যান্ড স্যান্ডস' কোম্পানি পিনবলের দুনিয়ায় অনেক পরে ঢুকেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে কোরিয়ান যুদ্ধ পর্যন্ত আমেরিকায় যুদ্ধের রমরমা বাজার ছিল। তারা তখন বোমা পরিবহনের ব্যবসা করত। তারপর একসময় যুদ্ধ থেমে গেল। বাধ্য হয়ে তাদের নতুন কোনো ব্যবসা খুঁজে নিতে হয়েছিল।

তখন তারা পিনবল মেশিন, বিংগো মেশিন, স্লট মেশিন, জুকবক্স, পপকর্ন ভেন্ডিং মেশিন এগুলো তৈরি করতে শুরু করে। ১৯৫২ সালের দিকে তারা তাদের তৈরি প্রথম পিনবল মেশিন বাজারে ছাড়ে। মেশিনটা খুব একটা খারাপ ছিল না। টেকসই, সস্তা, সাধারণ ডিজাইনের। কিন্তু সেটা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি। সে সময়ে বিলবোর্ড ম্যাগাজিনে সেটার ওপর খুব নেগেটিভ একটা রিভিউ ছাপা হয়েছিল। তার পরও লস হয়নি তাদের। মেশিনটা তৈরির পর প্রথম মেক্সিকোতে রপ্তানি করা হয়। তারপর একে একে মধ্য আমেরিকার অন্যান্য দেশে। যেসব দেশে মানুষ প্রযুক্তির খটমট বিষয়ে যেতে চায় না, খুব সহজে চালানো যায় এমন মেশিন চায়, সেখানে জিনিসটা বেশ জনপ্রিয় হয়।

ভদ্রলোক এই পর্যন্ত বলে এক গ্লাস পানি খেলেন। সম্ভবত ক্লাসরুমের মতো একটা প্রজেক্টর এবং লম্বা পয়েন্টার হলে তার বক্তৃতা দিতে আরাম হতো। রেস্টুরেন্টে সে রকম কোনো ব্যবস্থা ছিল না।

পৃথিবীতে পিনবল ব্যবসাটা তখন মূলত চারটা কোম্পানি নিয়ন্ত্রণ করত, তিনি বললেন, তাদের বলা হতো 'বিগ-ফোর'। বিগ-ফোরের কোম্পানিগুলো হলো গটলিভ, বালি, শিকাগো-কয়েন ও উইলিয়ামস। 'গিলবার্ট অ্যান্ড স্যান্ডস' কোম্পানি যখন বাজারে ঢোকার চেষ্টা করল, স্বাভাবিকভাবেই 'বিগ-ফোর' বিষয়টাকে খুব একটা ভালোভাবে নিল না। পাঁচ বছর ধরে রীতিমতো যুদ্ধ

করল তারা। ১৯৫৭ সালের দিকে তারা এই চেষ্টা বন্ধ করে দেয়।

বন্ধ করে দেয়? অবাক হয়ে জানতে চাইলাম।

হ্যাঁ, তারা যুদ্ধে টিকতে পারেনি, তিনি বললেন, যদিও মধ্য আমেরিকায় রপ্তানি করে তাদের মূলধনটুকু তত দিনে তুলে ফেলেছে। ব্রেক ইভেনে চলে আসার পরে তারা চিন্তা করল, এই যুদ্ধে খুব বেশি ক্ষতি হয়ে যাওয়ার আগে ব্যবসাটা ছেড়ে দেবে। আসলে তাদেরও দোষ ছিল না। পিনবল মেশিন তৈরি থেকে শুরু করে এটার রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবসাটা চালানো পুরোটাই একটা জটিল প্রক্রিয়া। বিশেষজ্ঞ ধরনের লোকের দরকার হয়। তা ছাড়া দেশজুড়ে ব্যবসাটা চালানোর জন্য দক্ষ টেকনিক্যাল কর্মী দরকার হয়। ধরেন কোথাও কোনো একটা মেশিনে সমস্যা দেখা দিল। পাঁচ ঘণ্টা সময় পাবেন সর্বোচ্চ। তার মধ্যে সেটা ঠিক করে দিতে হবে। গিলবার্ট কোম্পানির সেই ধরনের লোকবল ছিল না। শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে তারা ব্যবসা বন্ধ করে দেয়। মোট সাত বছর চালাতে পেরেছিল।

তিনি আর একটা বিরতি নিলেন। জ্যাকেটের পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরালেন।

তারা ব্যবসাটা তুলে দিল ঠিকই, তিনি বললেন, কিন্তু পিনবল নিয়ে তাদের ভাবনাটা বন্ধ হলো না।

সেটা কী রকম? আমি বললাম।

তারা হাল ছেড়ে দিল না। আসলে সম্ভবত তাদের অহংকারে লেগেছিল। তারা আগে যে মডেলের মেশিনটা বাজারে ছেড়েছিল সেটা তুলে নিয়ে একটা বড় অঙ্কের টাকা নতুন করে বিনিয়োগ করল। গোপন জায়গায় একটা ফ্যাক্টরি বসাল, সেখানে পিনবলের ওপর ব্যাপক গবেষণা শুরু করল। গবেষণার জন্য 'বিগ-ফোর' কোম্পানিগুলো থেকে কিছু কর্মীকে বেশি বেতনের লোভ দেখিয়ে ভাগিয়ে নিয়ে এল। পাঁচ বছর গোপন গবেষণার পর তারা এমন একটা পিনবল মেশিন তৈরি করল যেটা 'বিগ-ফোর' কোম্পানিগুলোর সঙ্গে যুদ্ধ করে টিকে থাকতে পারবে। শুরুটা হয়েছিল ১৯৫৯ সালে। শেষ হলো ১৯৬৪-তে।

যে পাঁচ বছর তারা গবেষণা করল, সেই সময়ের মধ্যে ভ্যাঙ্কুভার থেকে ওয়াইকিকি স্টেট পর্যন্ত নিজেদের একটা নেটওয়ার্ক গড়ে তুলল। ১৯৬৪ সালে তারা তাদের নতুন মডেলটাকে এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বাজারে ছাড়ল। মডেলটার নাম ছিল 'বিগ ওয়েভ'।

ভদ্রলোক তার লেদার ব্রিফকেস থেকে একটা স্ক্র্যাপবুক বের করে সেখানে 'বিগ ওয়েভ' মেশিনটার ছবি এবং ম্যানুয়াল আমাকে দেখালেন।

মেশিনটা সত্যিই অন্য রকম ছিল, তিনি বললেন, মেশিনটাতে তারা এমন কিছু বৈশিষ্ট্য জুড়ে দিয়েছিল, যা আগে কখনো দেখা যায়নি। যেমন ধরেন সিকোয়েন্স প্যাটার্ন। আপনার স্কিল লেভেলের সঙ্গে তাল রেখে সিকোয়েন্স প্যাটার্নটা সেট করার সুযোগ ছিল। মানুষ এই জিনিসটা সাদরে গ্রহণ করল। যদিও এখন এই আবিষ্কারগুলোর তেমন কোনো গুরুত্ব নেই। কিন্তু তখন এগুলো ছিল একেবারে নতুন। এ ছাড়া মেশিনটা ছিল খুবই হালকা এবং টেকসই। আগের মেশিনগুলো যেখানে মাত্র তিন বছর টিকত, সেখানে 'বিগ ওয়েভ' হেসেখেলে পাঁচ বছর টিকে যেত। পুরো খেলাটার মধ্যে ভাগ্যের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে দক্ষতার ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। সাধারণত খেলাটায় যাদের স্কিল লেভেল ভালো, তারা জিতে যেত।

গিলবার্ট কোম্পানি পরবর্তীকালে আরও অনেকগুলো মডেল বের করে। তার মধ্যে ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস, স্কাই পাইলট, ট্রান্স-আমেরিকা উল্লেখযোগ্য। প্রতিটি মডেলই খুব জনপ্রিয় হয়। এবং ভালোই ব্যবসা করে। স্পেসশিপ মডেলটা ছিল তাদের আবিষ্কার করা সর্বশেষ মডেল।

স্পেসশিপ মডেলটা অন্যগুলোর থেকে ছিল অনেকটাই আলাদা। মেশিনটার প্রধান বৈশিষ্ট্য এটা খুব সাধারণ। কিন্তু তারা এ রকম সাধারণ করে কেন তৈরি করেছিল?

পুরো ব্যাপারটাই একটা ধাঁধার মতো। প্রথম প্রথম মনে হতো এটাতে আলাদা কিছু নেই। কিন্তু কেউ যখন মেশিনটাতে খেলতে বসত, ধারণাটা মুহূর্তে বদলে যেত। কোথায় যেন আলাদা কিছু একটা ছিল। কেউ সেটা বুঝে ওঠার আগেই স্পেসশিপ সবার মন জয় করে ফেলল। দুটো কারণে আমি স্পেসশিপকে 'দুর্ভাগ্যের মেশিন' বলি।

প্রথম কারণ, কেউ সেটার সত্যিকারের রহস্যটা ধরতে পারেনি। যখন তারা এটার মাহাত্ম্য বুঝতে শুরু করল, তত দিনে দেরি হয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত, মেশিনটা তৈরি করার পর কোম্পানিটাই একদিন উঠে গেল। কোম্পানির মালিকের হুট করে একদিন মনে হলো, পুরো ব্যবসাটাই একধরনের অনৈতিক কাজ। এই জুয়ার ব্যবসা ছাড়াও তাদের বেশ চলে যাবে। তাদের অন্য আরও অনেক ব্যবসা ছিল। সেগুলোতে মন দিল তারা। কোম্পানি থেকে পিনবল ডিভিশনটাই তুলে

দিল। পুরো কাহিনি সেখানেই শেষ। প্রায় ১৫০০ মেশিন তৈরি করা হয়েছিল। আমেরিকায় এই জিনিসের এখনো বেশ চাহিদা আছে। অনেকে এটার জন্য ২০০০ ডলার দিতেও প্রস্তুত। কিন্তু তারা কখনোই সেটা কিনতে পারবে না।

কেন? জানতে চাইলাম আমি।

কারণ, তিনি বললেন, যাদের কাছে এই জিনিস আছে, তারা এটাকে সত্যিকারের ভালোবাসে। কেউ তাদের ভালোবাসা বিক্রি করে না।

বক্তৃতা শেষ করে তিনি ঘড়ি দেখলেন। সম্ভবত এটা তার অভ্যাস। প্রতিবার ক্লাসে বক্তৃতা শেষ করার পর তিনি ঘড়ি দেখেন। আরেকটা সিগারেট ধরালেন। এর মধ্যে দ্বিতীয় দফায় কফি চলে এল।

জাপানে এই মেশিন মোট কতগুলো এসেছিল, জানতে চাইলাম আমি।

তিনটা, তিনি বললেন।

মাত্র?

হ্যাঁ, কারণ গিলবার্ট কোম্পানি পৃথিবীজুড়ে যে ডিস্ট্রিবিউশন ব্যবস্থা তৈরি করেছিল, জাপান তার মধ্যে পড়ে না। ১৯৬৯ সালের দিকে একজন আমদানিকারক পরীক্ষামূলকভাবে মেশিনগুলো এনেছিলেন। সেগুলো অল্পদিনেই জনপ্রিয়তা পেয়ে যায়। যখন ভাবছিলেন আরও কিছু মেশিন আমদানি করবেন, তত দিনে কোম্পানিই উঠে গেছে।

আপনি কি জানেন ওই তিনটা মেশিন এখন কোথায় আছে?

একটার খবর আমি আপনাকে দিতে পারব। একটা মেশিন ছিল শিনজুকুর একটা ছোট গেম সেন্টারে। গেম সেন্টারটা প্রায় দুই বছর আগের এক শীতে বন্ধ হয়ে যায়। তারপর থেকে মেশিনটা কোথায় আছে কেউ জানে না।

আমি ওই শিনজুকুর মেশিনটাতেই খেলতাম।

আরেকটা মেশিন ছিল শিবুয়াতে। গত বসন্তে জায়গাটায় আগুন লেগে যায়। পুড়ে একদম ছারখার। অগ্নিবিমা করা ছিল। বিমা কোম্পানির কাছ থেকে তারা ক্ষতিপূরণও পেয়েছিল। কিন্তু মেশিনটা পুড়ে যায়। এই ব্যাপারটা নিয়ে যত ভাবি, ততই স্পেসশিপকে আমার 'দুর্ভাগ্যের মেশিন' মনে হয়।

এখন আমারও সে রকমই মনে হচ্ছে।

তৃতীয় মেশিনটা কোথায় আছে সে ব্যাপারে আমার কোনো ধারণা নেই।

আমার আছে। আমার হোমটাউনের এক বড় ভাইয়ের বারে মেশিনটা বসানো আছে।

তিনি আমার দিকে অবাক চোখে তাকালেন। আমি তাকে জে-র বারের টেলিফোন নম্বর দিয়ে বললাম, গত বছর পর্যন্ত এই বারে মেশিনটা ছিল। আমি সেখানে খেলেছি। এরপর সে গত সামারে জিনিসটা বিক্রি করে দিয়েছে।

কথাগুলো তিনি ডায়েরিতে নোট করে নিলেন।

আমি বললাম, আপনি কি আমাকে বলতে পারবেন শিনজুকুর মেশিনটা এখন কোথায় আছে?

অনেকগুলো সম্ভাবনা আছে, তিনি বললেন, প্রথম সম্ভাবনাটা হচ্ছে এটাকে সম্ভবত ভাঙারির দোকানে কেজি হিসেবে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। তিন বছর পর পর যেকোনো মেশিনের মধ্যে প্রযুক্তিগত কিছু পরিবর্তন আসে। সেটার দাম পড়ে যায়। তখন সেটার পেছনে আর পয়সা খরচ না করে মডেলটা চেঞ্জ করে ফেলাই ভালো। সে ক্ষেত্রে মেশিনটাকে সাধারণত মানুষ ভাঙারির দোকানে কেজি হিসেবে বিক্রি করে দেয়। দ্বিতীয় যে সম্ভাবনা, সেটা হচ্ছে কেউ হয়তো মেশিনটাকে সেকেন্ডহ্যান্ড কিনে নিয়েছে। কোনো একটা ছোটখাটো বারে হয়তো সেটাকে সেট করা হয়েছে। যদিও দ্বিতীয় সম্ভাবনাটা খুব কম। শতকরা আশি ভাগ ক্ষেত্রেই সেগুলোকে ভাঙারির দোকানে বেচে দেওয়া হয়।

আপনি যে দ্বিতীয় সম্ভাবনাটার কথা বললেন, সেটা কি চেক করে দেখার কোনো উপায় আছে?

জিনিসটা কঠিন হবে। তবু চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। আমার নিজেরও স্পেসশিপ সম্পর্কে বেশ আগ্রহ আছে।

আমি আপনার কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ থাকব যদি সেটা আপনি করেন।

মনে হলো ভদ্রলোক বেশ উদাস হয়ে গেলেন। সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে বললেন, আমাকে বলেন তো স্পেসশিপে আপনার হাইয়েস্ট স্কোর কত ছিল?

১৬৫,০০০।

অসাধারণ। সত্যিই হিংসে করার মতো একটা স্কোর।

১৮

পরের পুরোটা সপ্তাহ আমি বেশ শান্তিতে কাটিয়ে দিলাম। মাথার মধ্যে উদ্ভট কোনো চিন্তা এল না। পিনবল মেশিন তখনো আমার মনের মধ্যে ঘুরছিল। তবে ভাবনাটা যে ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে আসছে সেটা টের পেলাম। তখন শরতের মাঝামাঝি। গাছ থেকে পাতা ঝরতে শুরু করল। পুরো গলফ ক্লাব ঝরা পাতায় ভরে গেল। সেগুলোকে একসঙ্গে জড়ো করে যখন পোড়ানো হতো, আকাশে দড়ির মতো সাদা ধোঁয়ার একটা রেখা উঠে যেত। বাসার জানালা থেকে আমরা সে ধোঁয়া দেখতে পেতাম।

যমজ দুই বোন হঠাৎ করেই কেমন যেন বিষণ্ন হয়ে গেল। তারা আগের মতো কথা বলে না। কথায় কথায় হাসে না। মুখে মেঘের ছায়া টের পাওয়া যেত। সম্ভবত সুইচ প্যানেলের মৃত্যুশোক তারা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু সেটা তাদের প্রতিদিনের কাজকর্মে কোনো প্রকার বাধা হয়ে দাঁড়াত না। আমরা আগের মতোই হাঁটতে বের হতাম। কফি খেতাম, গান শুনতাম, একই কম্বলের নিচে জড়াজড়ি করে ঘুমোতাম। রোববারে বোটানিক্যাল গার্ডেনে বেড়াতে যেতাম। সেখানে ওকগাছের নিচে বসে স্পিন্যাচ স্যান্ডউইচ আর মাশরুম খেতাম।

ঠান্ডা পড়ে গিয়েছিল বলে আমি দুই বোনের জন্য নতুন দুটো স্পোর্টস শার্ট কিনলাম। সঙ্গে আমার পুরোনো দুটো সোয়েটার লকার থেকে বের করে ওদের পরতে দিলাম। সে কারণে ওদের ২০৮ এবং ২০৯ বলে ডাকা বন্ধ হয়ে গেল। তার বদলে ওদের নাম হলো, 'জলপাই-সবুজ-সোয়েটার' এবং 'ব্যাগি-গলা-সোয়েটার'। ওরা অবশ্য এটা নিয়ে কোনো অভিযোগ করল না। একদিন আমি ওদের জন্য শীতের মোজা আর স্নিকার্স কিনে আনলাম। নিজেকে তখন সান্তাক্লজ মনে হচ্ছিল।

অফিসেও আমার দিনগুলো ভালোই কেটে যাচ্ছিল। জমে থাকা কাজের পরিমাণ অনেক কম। এ কারণে আমি পায়ের ওপর পা তুলে আরাম করে সিগারেট খেতে খেতে মিউজিক শুনতাম। ধ্রুপদি জ্যাজ মিউজিক ছিল আমার প্রথম পছন্দ। উডি হ্যারমান আর বানি বেরিগানের জ্যাজ শুনতাম হুইস্কি খেতে খেতে। মাঝেমধ্যে ক্ষুধা পেলে একটা বা দুটো বিস্কুট খেয়ে নিতাম।

সেক্রেটারি মেয়েটার অবশ্য অনেক ব্যস্ত সময় কাটল। নভেম্বরে আমাদের

যে বেড়াতে যাওয়ার কথা, সেই ট্রিপের পুরো প্ল্যান সে একার হাতে তৈরি করছিল। ফ্লাইট এবং হোটেল রিজার্ভেশন করে ফেলল সে। এ ব্যাপারে একাধিক দ্বিপক্ষীয় মিটিং করল। কোনোবার দ্বিতীয় পক্ষ হিসেবে আমার পার্টনার বন্ধু আর কোনোবার আমি মিটিংয়ে যোগ দিলাম।

তার পরও মেয়েটার হাতে যেটুকু সময় ছিল তার মধ্যে আমার আরও দুটো সোয়েটার সেলাই করে দিল। আমার একটা স্পোর্টস জ্যাকেটের পেছনে পেতলের বোতামটায় জং ধরে গিয়েছিল। একদিন মেয়েটা দোকান থেকে নতুন একটা বোতাম কিনে এনে আগেরটা চেঞ্জ করে দিল। তার হাতে এর পরও সময় রয়ে গেল। সময়টাকে সে মোটেই আজেবাজে কাজে নষ্ট করল না, হেয়ারস্টাইলটা বদলে ফেলল। দোকান থেকে কাপড়চোপড় আর সাজসজ্জার জিনিসপত্র কিনল বেশ কিছু। ঠোঁটে পিঙ্ক লিপস্টিক লাগাতে শুরু করল। ক্লিভেজ বের করা পাতলা একটা সোয়েটার গায়ে দিল। শরৎ এসে তার মনকে সম্ভবত কিছুটা রাঙিয়ে দিয়েছে।

পুরো সপ্তাহটাই দারুণ কাটল। সম্ভবত এভাবেই পুরো জীবনটা পার হয়ে গেলে আমার আপত্তির কিছু ছিল না।

১৯

অবশেষে র‍্যাট একদিন ঠিক করল, শহর ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবে। দিনের পর দিন এখানে পচে-গলে মরে যাওয়ার কোনো অর্থ হয় না। এর চেয়ে অন্য কোথাও গিয়ে নতুন করে শুরু করাটাই ভালো।

এই ব্যাপারটা সে কী করে জে-কে বলবে তা বুঝে উঠতে পারল না। কাজটা তার কাছে রীতিমতো অসম্ভব ঠেকল। পরপর তিন রাত সে জে-র বারে গেল। যাওয়ার আগে প্রতিবারই মনে মনে ভেবেছে আজ বলবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বলতে পারল না। যতবারই সে বলতে চাইল, তার গলা শুকিয়ে গেল এবং সে একটা করে বিয়ার খেল। এভাবে প্রতিদিন তার সামনে আট-দশটা করে বিয়ারের খালি বোতল জমে যেত।

প্রতিদিনই রাত বারোটা পর্যন্ত সে নানাভাবে চেষ্টা করল। তারপর আর

বলতে পারবে না বুঝতে পেরে মনের মধ্যে একধরনের স্বস্তি এল তার। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল যেন। সেই রাতেও র‍্যাট প্রতিদিনের মতো স্বাভাবিকভাবেই জে-কে গুডনাইট বলে বার থেকে বেরিয়ে গেল।

অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে সে বিছানায় বসে টিভিটা চালাল। তারপর আবার বিয়ারের ক্যান খুলে একটা সিগারেট ধরাল। টিভিতে রবার্ট টেইলরের একটা পুরোনো ওয়েস্টার্ন ছবি দেখাচ্ছিল। ফাঁকে ফাঁকে বিজ্ঞাপন এবং আবহাওয়ার খবর। সেগুলোর যন্ত্রণায় ছবিটাই ঠিকমতো দেখা যাচ্ছে না। র‍্যাট একসময় বিরক্ত হয়ে টিভিটা বন্ধ করে দিল। বাথরুমে ঢুকে লম্বা সময় ধরে গোসল করে আরেকটা বিয়ারের ক্যান খুলল।

শহর ছেড়ে সে চলে যাবে বলে ঠিক করেছে। কিন্তু কোথায় যাবে? চোখের সামনে কোনো গন্তব্য দেখতে পেল না।

জীবনে প্রথমবারের মতো মনের মধ্যে এক তীব্র ভয় টের পেল সে। ভয়টা কালো রঙের এক গা ঘিনঘিন করা পতঙ্গের মতো তার গা বেয়ে উঠতে লাগল। সারা শরীরে সেই পতঙ্গের অস্তিত্ব টের পাচ্ছিল সে। এরপর বিয়ারের আরেকটা ক্যান খোলা ছাড়া কোনো উপায় রইল না।

তিন দিন ধরে র‍্যাটের ফ্ল্যাটটা বিয়ারের খালি ক্যান আর সিগারেটের টুকরোয় উপচে পড়ল। মেয়েটাকে সে পাগলের মতো মিস করতে শুরু করল। মনে হচ্ছিল, সে কোনো একটা ফাঁকফোকর গলে মেয়েটার শরীরের ভেতর ঢুকে যাবে এবং সেখানেই থেকে যাবে। আর বের হবে না। সে নিজেকে বোঝাল, এভাবে হবে না। তুমি যা ভাবছ, সেগুলো বাস্তব ভাবনা না। বাস্তবের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াও। মেয়েটার কাছে ফিরে যাওয়া এখন আর সম্ভব নয়। তুমি মেয়েটার থেকে নিজেই দূরে সরে এসেছ। আসার সময় পেছনের সেতুটা পর্যন্ত পুড়িয়ে দিয়েছ। সেখানে আর ফিরে যেতে পারবে না। এখন যে ঘরে তোমার মনটা বাস করছে, তুমি সেখানে দেয়াল তুলে দিয়েছ। সেই দেয়াল ভেদ করা কারও পক্ষে আর সম্ভব না।

র‍্যাট দূরের বাতিঘরের দিকে তাকাল। বাতিঘরের আলোয় আকাশটা মাঝেমধ্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে, অন্ধকার কেটে গিয়ে ভোরের আলোর মতো দেখাচ্ছে। র‍্যাট একসময় নিজের ভেতরের দুঃখটুকু বুকের মধ্যে কোলবালিশের মতো জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে গেল।

• • •

শহর ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্তটা পরিবর্তনের কোনো সুযোগ ছিল না। অনেক সময় নিয়ে ভেবে সে এই একটা সিদ্ধান্তে এসেছে। সব দৃষ্টিকোণ থেকেই ভেবেছে। পেছন থেকে কোনো টান অনুভব করেনি। সে চলে গেলে এ শহরের কারোরই কিছু থেমে থাকবে না। সবকিছুই আগের মতো চলবে।

তার পুরো ভাবনাটা জে-র কাছে এসে থেমে গেল। সে কোনোভাবেই জে-র কাছে কথাটা বলতে পারবে না। এমনকি সেটাও বুঝতে পারল না যে জে- কে তার সিদ্ধান্তটা সে কেন জানাতে পারছে না। পুরো ব্যাপারটাই খুব সহজ হওয়ার কথা। সে খুব স্বাভাবিকভাবে জে-র বারে যাবে। একটা বিয়ার খাবে। তারপর বলবে, আমি শহরটা ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

তারপর জে- কে শুভকামনা জানাবে। এমন না যে তারা দুজন বেশ ভালো বন্ধু। তাদের নিজেদের মধ্যে খুব কমই জানাশোনা আছে। হ্যাঁ এটা ঠিক, জে-র বারে বসে সে সন্ধ্যার সময় বিয়ার খায়। প্রতিদিন তার একই রুটিন। বছরের পর বছর ধরে এই কাজটা করছে। আড্ডা দেয়। কিন্তু নিজেদের সম্পর্কে তারা খুব কমই জানে। সে ধরনের কোনো বন্ধুত্ব তাদের মধ্যে হয়নি। শেষ পর্যন্ত তারা দুজন দুজনের কাছে অপরিচিত মানুষ। ইংরেজিতে যাকে বলে স্ট্রেঞ্জার। পথ চলতে চলতে রাস্তায় হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়া টাইপের।

সে ক্ষেত্রে জে-কে বলতে এত সমস্যা কেন?

সোমবার মাঝরাতের দিকে র‍্যাট জে-র বারের বাইরে গাড়ি পার্ক করল। শাটারটা নামানো। কিন্তু তালা দেওয়া নেই। তার মানে জে এখনো ভেতরেই আছে। বাসায় ফিরে যায়নি। শাটারটা ওপরে তুলল সে। জে তখন বাসায় ফিরবে। তার আগে শেষবারের মতো সবকিছু গুছিয়ে নিচ্ছে। র‍্যাটকে ভেতরে ঢুকতে দেখে সে মৃদু হাসল। বারের বিষণ্ন আলোয় হাসিটা বড় ম্লান দেখাল।

হুট করে যেন জে-র বয়স অনেক বছর বেড়ে গেছে। গালে কালো রঙের একটা ছায়া পড়েছিল। চোখগুলো অনেকটাই ভেতরে ঢুকে গেছে। ঠোঁটগুলো শুকনো আর সাদা। গলার রগ বেরিয়ে আছে। আঙুলগুলো নিকোটিনের স্পর্শে হলুদ।

র‍্যাট তাকে বলল, তোমাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

একটু ক্লান্ত, জে বলল, তুমি ঠিকই বলেছ। কোনো কোনো দিন আসে,

একটু ক্লান্ত হয়ে পড়ি। তোমারও নিশ্চয়ই এমন হয়।

র‍্যাট মাথা নেড়ে একটা চেয়ার টেনে বসল। বলল, একটা গান আছে। শুনেছ কি না জানি না, 'বৃষ্টিভেজা সোমবারগুলো আমাকে ক্লান্ত করে।'

গানটা শুনিনি। তবে কথাগুলো বেশ সত্য, জে বলল।

তোমার বাড়িতে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়া উচিত।

তাতে তেমন কোনো লাভ হবে বলে মনে হয় না। আজ রাতে ঘুম আসবে না।

র‍্যাট একবার ঘড়িটা দেখল। বারোটা বেজে বিশ মিনিট। পুরো জায়গাটাই আশ্চর্য রকম বিষণ্ন দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে, সময়টা এখানে এসে থেমে গেছে অথবা একেবারে মরে গেছে।

জে বলল, তুমি কি ফ্রিজ থেকে আমার জন্য একটা কোক নিয়ে আসতে পারবে? তোমার জন্য একটা বিয়ারও নিয়ে এসো।

র‍্যাট ফ্রিজ থেকে কোক, বিয়ার আর দুটো গ্লাস আনল।

গান শুনবে নাকি? জে জানতে চাইল।

আজ রাতে ইচ্ছে করছে না, র‍্যাট বলল, চুপচাপ বসে থাকতে ইচ্ছে করছে।

হুম, মাঝেমধ্যে এ রকম হয়। গুম মেরে চুপচাপ বসে থাকতে ইচ্ছা করে। মনে হয়, কোনো অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় বসে আছি।

র‍্যাট কথাটা শুনে একটু হাসল। দুজন নিঃশব্দে কোক আর বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিল। চারদিক একেবারে চুপচাপ। র‍্যাটের হাতঘড়ির টিকটিক শব্দটা পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে। সেখানে তখন বারোটা বেজে পঁয়ত্রিশ।

তোমার আজ নিজেকে ক্লান্ত কেন লাগছে? র‍্যাট জানতে চাইল।

তেমন কোনো কারণ নেই, জে উত্তর দিল।

ঠিক আছে। একটা প্রশ্ন করি তোমাকে। অন্য একটা বিষয়ে। তোমার কি কখনো মনে হয়, সবকিছু পচে যাচ্ছে?

হয়।

আমার সব সময়ই মনে হয় একধরনের পচনের মধ্যে আছি। নানাভাবে জিনিসগুলো পচে-গলে যাচ্ছে। পচনের হয়তো একশ একটা উপায় আছে। কিন্তু সেই পচন থেকে উদ্ধার পাওয়ার খুব বেশি উপায় আমাদের জানা নেই। খুব বেশি হলে দুটো বা তিনটে উপায় আছে।

সম্ভবত তুমি ঠিকই বলেছ।

কিন্তু আমরা যে উপায়টাই বেছে নিই না কেন কাজ হবে না তাতে। আমরা অতি অবশ্যই পচে-গলে ধ্বংস হয়ে যাব।

জে কোকের গ্লাসে চুমুক দিয়ে চুপচাপ শুনে গেল।

তার পরও মানুষ চেষ্টা করে, র‍্যাট বলল, যদিও আমি বুঝে পাই না, কেন চেষ্টাটুকু করতে যায় তারা! যত চেষ্টাই তারা করুক, পচনের হাত থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারবে না। ধ্বংস অনিবার্য। আমি কি ভুল কিছু বললাম?

না। ঠিকই বলেছ, জে উত্তর দিল।

সে কারণেই যারা হাসিমুখে সব জেনেবুঝে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়, তাদের নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। এই পুরো শহরটাই খুব দ্রুত পচে যাচ্ছে।

জে কিছু বলল না। র‍্যাট হাত বাড়িয়ে একটা ম্যাচের কাঠি জ্বালাল। আগুনের দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইল। একটা সিগারেট ধরাল।

মনে হচ্ছে, জে বলল, পচে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচার জন্য তুমি কিছু একটা প্ল্যান বের করেছ। ঠিক বলেছি?

একদম ঠিক, র‍্যাট উত্তর দিল।

এখানে একটা ছোট্ট সমস্যা আছে। সেটা হচ্ছে, মানুষ খুবই অদ্ভুত একটা প্রাণী। তুমি বা আমি যতটা অদ্ভুত বলে ভাবছি, তার চেয়ে অনেক বেশি অদ্ভুত। সে কারণে তার প্ল্যানগুলো শেষ পর্যন্ত প্ল্যান আকারেই থেকে যায়। বাস্তবায়ন হয় না।

সম্ভবত আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি, র‍্যাট বলল, বুঝতে পারছি না, আমি কী করব।

তোমার অবস্থাটা আমি বুঝতে পারছি।

র‍্যাট উঠে দাঁড়াল। টেবিল থেকে সিগারেট এবং লাইটার তুলে নিয়ে পকেটে ভরল। ততক্ষণে ঘড়িতে একটার বেশি বাজে।

গুড নাইট, র‍্যাট বলল।

গুড নাইট, জে বলল, একবার এক লোক আমাকে বলেছিল, বিয়ার খেয়ে বাড়ি ফেরার পথে ধীরে হাঁটবে। আর বাড়িতে ফিরে বেশি করে পানি খাবে।

র‍্যাট জে-র দিকে তাকিয়ে হাসল। দরজাটা খুলে সিঁড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে নামতে শুরু করল। রাস্তায় স্ট্রিট ল্যাম্পের উজ্জ্বল আলো। কিন্তু একটা লোকও নেই সেখানে। পুরোপুরি মরুভূমি। সে আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবতে শুরু করল, তাকে ঠিক কতটা পানি খেতে হবে।

২০

মাঝখানে বেশ কিছুদিন কেটে গেল।

নভেম্বরের ছুটি কাটিয়ে অফিসে আসার পর একদিন লাঞ্চ টাইমে সেই স্প্যানিশ শিক্ষক আমাকে ফোন দিলেন। আমার পার্টনার তখন একটা কাজে ব্যাংকে গেছে। আমি কিচেনে বসে সেক্রেটারি মেয়েটার বানানো স্প্যাগেটি খাচ্ছিলাম। রান্না খুব একটা খারাপ হয়নি। যদিও স্প্যাগেটিটা একটু বেশি সেদ্ধ হয়েছে। এবং কী কারণে তার ভেতরে পুদিনাপাতা দেওয়া হয়েছে আমি নিশ্চিত ছিলাম না। তার পরও খেতে খুব একটা খারাপ লাগছিল না।

আমরা যখন স্প্যাগেটি রান্নার সঠিক উপায় নিয়ে একটা সিরিয়াস ধরনের আলাপের মধ্যে ছিলাম, তখনই ফোনটা বাজল। মেয়েটা উঠে গিয়ে রিসিভার কানে দিল। দু-একটা কথা বলার পরই সে আমাকে ইশারা করল ফোনটা ধরার জন্য। আমি উঠে গিয়ে ফোনটা ধরতেই ওপাশ থেকে সেই এনএইচকে টিভির সন্ধ্যা সাতটার খবর শুনতে পেলাম।

স্পেসশিপটার ব্যাপারে একটা খবর ছিল, তিনি বললেন, আমি ওটা খুঁজে পেয়েছি।

কোথায়? আমি প্রায় চিৎকার করে উঠলাম।

ফোনে সেটা বলাটা একটু কঠিন।

আমি একটুক্ষণ চুপ করে রইলাম।

তিনি বললেন, আসলে আমাকে অনেকগুলো জিনিস আপনার কাছে ব্যাখ্যা করতে হবে। সেটা ফোনে সম্ভব নয়। হয়তো আমি যা বলছি আপনি সেটা বিশ্বাস করতে পারবেন না।

মানে, আমি বললাম, আপনি আমাকে নিয়ে সোজা স্পেসশিপের সামনে দাঁড় করিয়ে দিতে চাচ্ছেন, যেন আমার বিশ্বাস হয় সবকিছু।

ঠিক তা-ও না। আমি আসলে বলতে চাচ্ছি, আপনি মেশিনটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেও হয়তো বিশ্বাস করতে পারবেন না।

আমি অনেকক্ষণ কোনো কথা খুঁজে পেলাম না। অপেক্ষা করছিলাম উনি আবার কখন কথা বলতে শুরু করবেন।

দেখেন, তিনি বললেন, আমি আপনার সঙ্গে কোনো রসিকতা করছি না।

আমাদের দেখা হওয়াটা জরুরি।

নিশ্চয়ই, আমি বললাম।

আজ বিকেল পাঁচটায় দেখা করতে পারবেন?

হ্যাঁ পারব। আচ্ছা আমি কি মেশিনটাতে আজ খেলতে পারব?

নিশ্চয়ই পারবেন।

কোথায় দেখা হবে?

আগের কফিশপে।

ঠিক আছে। বিকেল পাঁচটায় আমি ওখানে থাকব, আমি বললাম।

ফোনটা নামিয়ে রাখতেই মেয়েটা বলল, তুমি বিকেলে কোথায় যাবে?

পিনবল খেলতে যাব, বললাম আমি, তবে কোন জায়গায় গিয়ে খেলব, সেটা জানি না।

পিনবল?

হ্যাঁ। পিনবল হলো এমন একটা খেলা যেখানে বল থাকে, ফ্লিপার দিয়ে সেটাকে হিট করতে হয়, টার্গেটে মারতে হয়।

সেটা আমি জানি। কিন্তু তুমি হুট করে কেন পিনবল খেলতে যাবে?

কেন যাব? এর পেছনে সম্ভবত কোনো শক্ত কারণ আছে। কিন্তু এ মুহূর্তে সেটা আমি বলতে পারছি না। তুমি তো জানোই পৃথিবীতে অনেক কিছুই আছে, যেগুলোকে দর্শনশাস্ত্র ঠিকমতো ব্যাখ্যা করতে পারে না।

সে আমার কথা শুনে বেশ ধন্ধে পড়ে গেল। সম্ভবত তার মনে কিছু একটা তালগোল পাকিয়ে গেছে। টেবিলে কনুই তুলে গালে হাত দিয়ে বসে বিষয়টা নিয়ে ভাবল কিছুক্ষণ।

তুমি কি পিনবল খুব ভালো খেলো? সে জানতে চাইল।

খেলতাম একসময়, আমি বললাম, প্রচুর সময় কেটেছে আমার পিনবল মেশিনকে ঘিরে। পৃথিবীতে এই একটা জিনিসেই সম্ভবত আমার বেশ দক্ষতা আছে। এবং এটা নিয়ে আমি অহংকার করতে পারি।

তাও ভালো। কিছু একটা জিনিসে তোমার দক্ষতা আছে। আমার তো এ রকম কিছুই নেই।

সেটাও একদিক দিয়ে দেখলে খারাপ না। তোমার যখন কিছুই থাকবে না, তখন হারানোর ভয়ও থাকবে না।

সে যখন আমার কথাগুলো নিয়ে ভাবছিল আমি প্লেটের বাকি স্প্যাগেটিটুকু

শেষ করে ফেললাম। ফ্রিজ থেকে আদার রস বের করে চুমুক দিলাম।

যেটা একসময় হারিয়ে যাবে, আমি বললাম, সেটা থাকার কোনো মানে নেই। যে গৌরব একদিন হারিয়ে যাবে বলে তুমি নিশ্চিত, সেটা কখনোই সত্যিকারের গৌরব হতে পারে না।

এটা কি কোনো কোটেশন? নাকি তুমি এইমাত্র বানালে?

খুবই বিখ্যাত এক লোকের কথা।

কার কথা? সে জানতে চাইল।

মনে করতে পারছি না। কিন্তু কথাটার সঙ্গে আমি পুরোপুরি একমত।

পৃথিবীতে কি এমন কিছু আছে, যেটা কখনো হারাবে না?

আমি বিশ্বাস করি নিশ্চয়ই আছে, বললাম আমি, তোমারও সে রকমই বিশ্বাস করা উচিত। এই বিশ্বাসটুকু ছাড়া বেঁচে থাকা বেশ কষ্টকর হওয়ার কথা।

আমি চেষ্টা করব বিশ্বাস করতে, সে বলল।

পৃথিবীটাকে আমি একটা রঙিন চশমার মধ্য দিয়ে দেখতে ভালোবাসি। বলতে পারো, আমি বেশ আশাবাদী একজন মানুষ। তবে আশাবাদী হতে গেলে একটা মানুষকে যতটা বোকা হতে হয়, ততটা বোকা আমি আবার না।

সেটা আমি জানি।

আমি তর্ক করছি না। কিন্তু এটা বিশ্বাস করি, আশাবাদী হয়ে বেঁচে থাকাটা খুব চমৎকার একটা ব্যাপার। নৈরাশ্যবাদের থেকে হাজার গুণে ভালো।

আশাবাদী হওয়ার সঙ্গে পিনবল খেলার সম্পর্ক কী বুঝতে পারছি না।

আমিও পারছি না। কোনো সম্পর্ক বের করা যায় কি না, সেটা বোঝার জন্যই পিনবল খেলাটা আমার জন্য জরুরি।

দেখি হাত দুটো উঁচু করো তো, সে বলল।

আমি আমার দুটো হাত উঁচু করে সিলিংয়ের দিকে ধরলাম। সে আমার বগলের নিচে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখল, সোয়েটারটা আবার কোথাও ছিঁড়ে গেছে কি না।

না সব ঠিকই আছে, সে বলল।

বিকেল পাঁচটার আগেই সেই কফিশপে হাজির হলাম। স্প্যানিশ শিক্ষক দুই মিনিটের মধ্যে চলে এলেন। আমরা দুজন এক সেকেন্ড সময় নষ্ট না করে ট্যাক্সি নিয়ে নিলাম। তিনি ট্যাক্সি ড্রাইভারকে মেইজি অ্যাভিনিউ ধরে সোজা

যেতে বললেন।

যেতে যেতে তিনি পকেট থেকে এক প্যাকেট সিগারেট বের করে নিজে একটা ধরিয়ে আমার দিকে প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিলেন। ভদ্রলোক আজ ধূসর স্যুটের সঙ্গে নীল টাই পরেছেন। শার্টটাও নীল রঙের। তবে টাইয়ের রঙের চেয়ে শার্টের নীল রংটা একটু ফ্যাকাশে ধরনের। আমি পরেছি একটা ধূসর রঙের সোয়েটার, সঙ্গে জিনস। পায়ে বাচ্চা কুকুর আকৃতির সেই বিখ্যাত জুতো। ট্যাক্সিতে বসে মনে হচ্ছিল ইউনিভার্সিটিতে আমার শিক্ষকের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

জায়গাটা কি অনেক দূরে? আমি জানতে চাইলাম।

হ্যাঁ, একটু দূর আছে, তিনি উত্তর দিলেন, মেশিনটা খুঁজে পেতে অনেক সময় লেগেছে। কষ্টও হয়েছে খুব। যারা পিনবল ফ্যানাটিক, মানে যারা পিনবল নিয়ে সারা দিন পড়ে থাকে, আমার কাছে তাদের একটা লিস্ট ছিল। সেই লিস্ট ধরে সবার সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। শুধু টোকিও শহর না, পুরো দেশের সবার সঙ্গেই কথা বলেছি। লিস্টে বিশজনের নাম ছিল। কাউকে বাদ দিইনি। কিন্তু তাদের সঙ্গে কথা বলে কোনো লাভ হয়নি। আমি যেটুকু জানতাম, তারাও ঠিক ততটুকুই জানে। এরপর যেসব ডিলার পিনবল মেশিন নিয়ে কাজ করে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করি। পুরো জাপানে তারা যতগুলো মেশিন পৌঁছে দিয়েছে, সেই সংখ্যাটা অনেক বেশি। কোনো একটা নির্দিষ্ট মডেলের মেশিনের কথা মনে রাখাটা তাদের জন্য খুব কঠিন। ভাগ্য ভালো যে আমার সম্ভাব্য তারিখটা মনে ছিল। ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের কথা বলতেই ওই মাসের কাগজপত্র ঘেঁটে তারা মেশিনটা খুঁজে বের করে। গিলবার্ট অ্যান্ড সন্স কোম্পানির তৈরি করা স্পেসশিপ। সিরিয়াল নম্বর ১৬৫২০৯। ফেব্রুয়ারি ৩, ১৯৭১ সালে মেশিনটা তারা ভাঙারির দোকানে পৌঁছে দেয়।

ভাঙারির দোকান? আমি অবাক হয়ে বললাম।

হ্যাঁ, সে রকমই লেখা।

কিন্তু আপনি তো বলেছিলেন, আমি আজ মেশিনটাতে খেলতে পারব।

আমাকে শেষ করতে দিন। আমি ডিলারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাড়িতে ফিরে এলাম। এবং মনে মনে ধরে নিলাম, বিষয়টার সেখানেই শেষ। কিন্তু হুট করে আমার মনের মধ্যে কিছু একটা খোঁচাতে শুরু করল। এটাকে আপনি ইনটিউশন বলতে পারেন। আমার ইনটিউশন আমাকে বলল যে স্পেসশিপটাকে ভেঙে ফেলা হয়নি। পরদিন সকালে আমি আবার সেই ডিলারের কাছে হাজির

হলাম। তার কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে যেখানে জিনিসপত্রগুলো ভাঙা হয়, সেই স্ক্র্যাপ ইয়ার্ডে গিয়ে পৌছালাম।

তারপর?

সেখানে মানুষজন কাজ করছিল। কিছু না বলে আধা ঘণ্টা ধরে তাদের কাজকর্ম দেখলাম। তারপর অফিস রুমে গিয়ে আমার কার্ডটা একজনকে দেখালাম। তারা আমাকে বেশ সম্মান দেখাল। আসলে মানুষজন ভাবে যে ইউনিভার্সিটির শিক্ষক মানেই বেশ বড় একটা ব্যাপার। অবশ্য তাদেরও দোষ দেওয়া যায় না। তারা তো আর জানে না যে আমরা আসলে তেমন কোনো কাজই করি না। এবং অর্থনৈতিকভাবেও মোটামুটি পঙ্গু।

ভদ্রলোক একাই বলে যাচ্ছিলেন। সম্ভবত পুরো ব্যাপারটা বলতে তার বেশ ভালো লাগছিল। তিনি বলে গেলেন, আমি তখন একটা গল্প বানালাম। অফিসের লোকটাকে বললাম, আমি একটা বই লিখছি, যেখানে ভাঙারির জিনিসপত্রগুলো নিয়ে কী করা হয়, সেই কথাগুলো থাকবে। সে জন্য কিছু তথ্য দরকার।

সে বেশ আগ্রহের সঙ্গেই রাজি হলো। কিন্তু ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আনা কোনো পিনবল মেশিন সম্পর্কে তথ্য দিতে পারল না। অবশ্য সেটাই স্বাভাবিক। মাঝখানে দুটো বছর পার হয়ে গেছে। এত কাজের ভিড়ে একটা পিনবল মেশিনের কথা কোন পাগল মনে রাখতে যাবে? তখন আমি শেষ চেষ্টা হিসেবে তাকে বললাম, ধরেন আমার একটা ওয়াশিং মেশিন অথবা মোটরবাইকের চেসিস লাগবে। আপনি কি আমার কাছে জিনিসটা বিক্রি করতে পারবেন, যদি আমি ঠিকঠাক দাম দিই?

নিশ্চয়ই পারব, সে বলল।

তখন তাকে বললাম, এ রকম কি কখনো ঘটেছে যে আপনারা ভাঙার জন্য পুরনো পিনবল মেশিন কিনে এনেছেন। কিন্তু কেউ সেগুলো আপনাদের কাছ থেকে আবার কিনে নিয়ে গেছে?

সে বলল, এ ব্যাপারটা তার ভালো করে জানা নেই। আসলে সে দেখে ভাঙাভাঙির ব্যাপারটা। বেচাবিক্রির ব্যাপারটা তাদের সুপারভাইজার দেখেন। তিনি তিনতলায় বসেন। আমার যদি এ ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য দরকার হয়, আমি যেন তিনতলায় চলে যাই, তার রেফারেন্স দিয়ে সুপারভাইজারের সঙ্গে কথা বলি।

তাকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি সোজা তিনতলায় চলে গেলাম এবং সুপারভাইজারকে খুঁজে বের করলাম। তার সঙ্গে পুরো ব্যাপারটা শেয়ার করে

জানতে চাইলাম, আপনাদের এখান থেকে পুরোনো পিনবল মেশিন কিনে নিয়ে যায়, এ রকম কেউ আছে কি না?

তিনি বললেন, একজন আছে।

তিনি কী ধরনের পিনবল মেশিন আপনাদের কাছ থেকে কেনেন?

সব ধরনের। আমাদের এখানে কোনো ধরনের পিনবল মেশিন এলেই আমরা তাকে ফোন দিই। বাতিল মালগুলো তিনি ঘুরে ঘুরে দেখেন। তারপর তার যেটা পছন্দ হয় সেটা টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে যান।

এ পর্যন্ত কতগুলো মেশিন তিনি কিনেছেন?

এটা তো খুবই কঠিন প্রশ্ন।

সঠিক সংখ্যাটা আমার দরকার নেই। আনুমানিক বললেই হবে।

৫০টা তো হবেই।

৫০!

হুম, তিনি বললেন, আমি অনুরোধ করে তার থেকে লোকটার ফোন নম্বর আর অ্যাড্রেস নিয়ে নিলাম।

এতক্ষণ চুপচাপ স্প্যানিশ শিক্ষকের কথা শুনছিলাম। বললাম, আমরা দুজন কি এখন সেই ভদ্রলোকের ওখানে যাচ্ছি?

হ্যাঁ, তিনি বললেন।

২১

সন্ধ্যা নেমে গেছে ততক্ষণে। ট্যাক্সিটা বিরামহীনভাবে ছুটে চলেছে। আঁধারে ডুবে যাচ্ছে সবকিছু। একরঙা আঁধার নয় বিভিন্ন স্তরে সাজানো আলাদা-আলাদা কালো রং। কালো রঙের যে এ রকম আলাদা আলাদা শেড আছে, সেটা আগে বুঝতে পারিনি। কিছু সময় পর সব কটি শেড একসঙ্গে মিলে গিয়ে একরঙা কালো হয়ে গেল। যেন একটা বড় কালো রঙের পাখি তার বিশাল দুটো ডানা মেলে আমাদের জড়িয়ে ধরল। আমরা ডুবে গেলাম গাঢ় গভীর অন্ধকারে।

ট্যাক্সিটা ততক্ষণে শহর ছেড়ে বাইরে চলে এসেছে কি না ব্যাপারটা নিশ্চিত হতে পারছিলাম না। যত সামনে এগোচ্ছি, রাস্তায় বাড়িঘরের পরিমাণ একটু একটু করে কমে আসছিল। রাস্তার পাশের মাঠ থেকে ঝিঁঝি পোকার ডাক শুনতে পেলাম।

পুরোটা পথ আমরা দুজন আর কোনো কথা বললাম না। একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে চললাম। ট্যাক্সি ড্রাইভারও আমাদের সঙ্গে সিগারেট ধরাল। পুরো ট্যাক্সি ধোঁয়ায় ঢেকে গেল। মনে এক মারাত্মক অস্বস্তি খচখচ করছিল। কয়েকবার মনে হলো, ট্যাক্সির দরজা খুলে রাস্তায় ঝাঁপ দিই। এক দৌড়ে পালিয়ে যাই।

আমি কেন এই ভদ্রলোকের সঙ্গে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ছুটে যাচ্ছি। পিনবল মেশিনের সঙ্গে ডেট করতে? পুরো ভাবনাটাই হাস্যকর। এটা একটা স্বপ্ন হতে পারে। কিন্তু সেই স্বপ্নটাও অর্থহীন এবং হাস্যকর।

একটা খোলা মাঠের কাছাকাছি গিয়ে স্প্যানিশ শিক্ষক ড্রাইভারকে গাড়ি রাখতে বললেন। আমি গাড়ি থেকে নামলাম। সঙ্গে সঙ্গে একটা ঝাঁঝাল গন্ধ নাকে এসে লাগল। প্রথমে বুঝতে পারছিলাম না গন্ধটা কিসের। পরে বুঝলাম, বাজারে মুরগির গা থেকে যে রকম গন্ধ আসে সে রকম একটা গন্ধ পাচ্ছি। অথচ চারপাশে কোনো মুরগি নেই।

শরীরের জড়তা কাটানোর জন্য হাত-পা ছুড়লাম কিছুক্ষণ। বড় করে একটা শ্বাস নিয়ে স্প্যানিশ টিচারকে জিজ্ঞেস করলাম, আমরা কি এখনো টোকিওতেই আছি?

হ্যাঁ, তিনি বললেন, কোথায় আর যাব?

আমার তো মনে হচ্ছে পৃথিবীর শেষ প্রান্তে চলে এসেছি।

ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন। যেন বোঝাতে চাইলেন, আপনার যেটা খুশি ভাবতে পারেন। তারপর দূরের অন্ধকারের দিকে দুটো আঙুল পিস্তলের মতো তাক করে বললেন, ওই যে দূরে দেখতে পাচ্ছেন, একটা বেড়া দিয়ে ঘেরা জায়গা, অন্ধকার বলে হয়তো ভালোমতো বোঝা যাচ্ছে না। এখান থেকে তিনশ মিটারের মতো হবে ... ওখানে গেলে আপনি গুদামটা পাবেন।

গুদাম? আমি বললাম।

হ্যাঁ। একটা বড় বিল্ডিং আছে। বিল্ডিংটাকে মুরগির ফার্মের কোল্ড স্টোরেজ

হিসেবে ব্যবহার করা হতো। কিন্তু এখন আর ব্যবহার করা হয় না। ফার্মটা উঠে গেছে।

আমি বাতাসে একবার নিশ্বাস নিয়ে বললাম, কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে মুরগির গন্ধ পাচ্ছি।

তিনি বললেন, হতে পারে গন্ধটা এখানকার মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। এ রকম হয়। ফার্মটা দীর্ঘদিন ধরে এ এলাকায় ছিল। যখন বৃষ্টি নামে তখন নাকি অনেকেই মুরগির ডানা ঝাপটানোর শব্দ শুনতে পায়।

আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখান থেকে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। সামনে পুরোটাই অন্ধকার। শুধু অন্ধকার বললে হয়তো বোঝা যাবে না। এমন অন্ধকার যা মনে ভয় ধরাবে। কল্পনায় মুরগির ডানা ঝাপটানোর শব্দও যেন শুনতে পেলাম। ভয় আরও বাড়ল।

গুদামঘরটায় সব সময় তালা মারা থাকে, তিনি বললেন, আমি মালিককে অনুরোধ করেছি, আপনার জন্য যেন আজকের সন্ধ্যায় খোলা রাখা হয়। আপনি যে মেশিনটা খুঁজছেন, সেটা গুদামের ভেতরে আছে।

আপনি কি ভেতরে গিয়ে মেশিনটা দেখে এসেছেন? আমি জানতে চাইলাম।

হ্যাঁ, একবার গিয়েছিলাম। গুদাম ঘরের মালিক আমাকে অনুমতি দিয়েছিলেন। ভেতরটা অন্ধকার। দরজা দিয়ে ঢুকে ডান দিকে সুইচবোর্ড পড়বে। বাতি জ্বালিয়ে নেবেন। না হলে কোথাও ধাক্কা খেতে পারেন। অথবা নিচে নামার সিঁড়িতেও পড়ে যেতে পারেন।

আপনি আমার সঙ্গে যাবেন না ওখানে?

না আপনাকে একাই যেতে হবে। আমাদের চুক্তিটা সে রকমই।

চুক্তি?

হ্যাঁ। আপনি যতক্ষণ খুশি ভেতরে থাকতে পারেন। ফিরে আসার সময় বাতিটা নিভিয়ে দিতে ভুলবেন না যেন।

আপনার কি গুদামঘরের মালিকের সঙ্গে দেখা হয়েছে কখনো? জানতে চাইলাম আমি।

হ্যাঁ, তিনি বললেন।

তিনি ঠিক কী ধরনের মানুষ?

আলাদা কোনো কিছু না। আপনার-আমার মতোই। অন্তত বাইরে থেকে দেখলে সে রকমই মনে হয়।

তা-ই যদি হবে, তাহলে উনি কী কারণে পঞ্চাশটা পুরোনো পিনবল মেশিন কিনতে যাবেন? সাধারণ মানুষ পঞ্চাশটা মেশিন কিনে একটা গুদামের ভেতর ভরে রাখবে কেন?

দেখেন পৃথিবীতে সব ধরনের মানুষই আছে। যার যেটা ইচ্ছে সেটাই করবে। ব্যাপারটাকে সহজভাবে দেখলেই মিটে গেল।

কথাটা বলে তিনি হাতের সিগারেটটাকে পা দিয়ে মাড়ালেন। উল্টো ঘুরে ট্যাক্সির দিকে হাঁটতে শুরু করলেন। বাতাস একটু একটু করে ঠান্ডা হয়ে আসছিল। এক তীব্র ভয় এসে আমার মনে বাসা বাঁধল। যদিও তিনি বললেন, বিষয়টা খুব সহজভাবে দেখলেই মিটে যাবে, আমার কাছে সে রকম মনে হলো না। অসম্ভব জটিল একটা বিষয় বলে মনে হলো।

তাকে পেছন থেকে একবার ধন্যবাদ জানিয়ে গুদামঘরটার দিকে এগোতে শুরু করলাম। আমার মাথায় ঘুরেফিরে চিন্তাটা আবার এল। কারও কারও ওয়াইন সংগ্রহের বাতিক থাকে বলে শুনেছি। বাড়িতে কেউ বিভিন্ন ব্র্যান্ডের পঞ্চাশটা ওয়াইনের বোতল রাখলে একটা কথা ছিল। সেটা স্বাভাবিকভাবে নেওয়া গেলেও পঞ্চাশটা পিনবল মেশিন কারও ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকাটা মোটেই সাধারণ কোনো বিষয় নয়।

বেড়া ঘেঁষে দাঁড়ালাম। সামনে গুদামঘরটা দাঁড়িয়ে আছে। যেন অন্ধকারে কোনো ভয়ংকর জন্তু ওত পেতে আছে। আশপাশের মাটিতে ঘাস বড় হয়ে মাথার সমান উঁচু হয়ে গেছে। বিল্ডিংয়ের দেয়ালগুলো ধূসর রঙের। কোনো জানালা নেই। স্টিলের ফ্রেমের দরজার ওপরে একটা নাম লেখা। কোম্পানির নাম হবে হয়তো। ঠিক দশ কদম দূরে দাঁড়িয়ে পুরো বিল্ডিংটাকে আবার ভালো করে দেখলাম। দেখে জিনিসটার কোনো ভালো বা খারাপ দিক বের করতে পারলাম না। মনের গভীরে শুধু একটা আবছা ভয় টের পেলাম।

সরাসরি ঠান্ডা স্টিলের দরজায় একটা ধাক্কা দিলাম। দরজাটা মৃদু শব্দে তুলে হাঁ করে খুলে গেল। আমার সামনে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের এক অন্ধকার আমি দেখতে পেলাম। বাইরের অন্ধকারের সঙ্গে ভেতরের অন্ধকারের আকাশ-পাতাল পার্থক্য।

২২

ডান দিকের দেয়ালে সুইচবোর্ড থাকার কথা। খুঁজে পেয়ে বাতি জ্বালালাম। গুদামঘরটা ফ্লুরোসেন্ট আলোয় ভেসে গেল। কমপক্ষে একশটা বাতি একসঙ্গে জ্বলে উঠেছে। বাইরে থেকে দেখতে যতটা বড় মনে হচ্ছিল, ভেতর থেকে সাইজে তার অন্তত দ্বিগুণ মনে হলো গুদামটাকে। ফ্লুরোসেন্ট বাতির তীব্র আলো সহ্য করতে না পেরে কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে রইলাম। চোখ দুটো যখন খুললাম, কিছুক্ষণ আগের অন্ধকারটুকু পুরোপুরি স্মৃতির মধ্যে হারিয়ে গেছে।

গুদামের ভেতরটা দেখলে মনে হয়, একটা বড়সড় রেফ্রিজারেটরের পেটের ভেতরে ঢুকে পড়েছি। স্প্যানিশ শিক্ষক অবশ্য আমাকে সে রকমই বলেছেন। জায়গাটাকে আগে মুরগির ফার্মের কোল্ডস্টোরেজ হিসেবেই ব্যবহার করা হতো। ভেতরের দেয়ালগুলো বেশ পুরু এবং সেখানে সাদা রং করা। আলো পড়ে সেগুলো জ্বলজ্বল করছে। আমি ভয়ে ভয়ে একবার পেছনের দরজার দিকে তাকালাম। মনে হচ্ছিল, আমি বোধ হয় কোনো একটা ফাঁদে আটকা পড়েছি। এবং সেখানেই আমাকে চিরজীবন আটকে থাকতে হবে। কোনো সন্দেহ নেই যে পৃথিবীতে এ রকম বিল্ডিং দ্বিতীয়টা তৈরি হয়নি। সেটাই একমাত্র বিল্ডিং যেখানে ঢুকে এ ধরনের অনুভূতি হতে পারে।

গুদামঘরটাকে হাতিদের কবরস্থান হিসেবেও ব্যবহার করা যেত। স্তূপ করে হাতির সাদা কঙ্কাল থাকতে পারত। কিন্তু তার বদলে জায়গাটা জুড়ে সারিবদ্ধভাবে অসংখ্য পিনবল মেশিন সাজানো। বিস্ময়ে হাঁ করে আমি পুরো জিনিসটা দেখলাম। গুনতে শুরু করলাম। ৭৮ পর্যন্ত গোনার পর গিয়ে থামলাম। একটা সিগারেট ধরিয়ে আবার প্রথম থেকে গুনে দেখলাম। প্রথমবারের গোনাটা ঠিকই আছে। মোট ৭৮টা পিনবল মেশিন।

প্রতিটা মেশিনকেই একই দিকে মুখ করে দাঁড় করানো। মোট আটটা কলামে সারিবদ্ধভাবে তাদের রাখা আছে। একটা মাছিকে অ্যাক্রিলিক রেসিনে ছেড়ে দিলে যেভাবে জমে যায়, মেশিনগুলোকে দেখে মনে হচ্ছিল, তারা সেভাবে একেবারে জমে গেছে। ৭৮টা আলাদা আলাদা মৃত্যু, ৭৮টা আলাদা ধরনের নৈঃশব্দ্য। মন বলছিল, জায়গাটা ছেড়ে এখনই চলে যেতে হবে। না

হলে হয়তো এই মৃত্যুপুরীতে আমি চিরকালের মতো আটকে যাব।

জায়গাটা ভয়ংকর ঠান্ডা। বাতাসে মুরগির গন্ধ। গন্ধ শুঁকে মৃত বা জীবিত হয়তো বোঝা যায় না। কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম, সেগুলো মৃত মুরগির গন্ধ। আমি সিঁড়ি বেয়ে পাঁচটা ধাপ নিচে নামলাম। ঠান্ডাটা একটু যেন বাড়ল। তবুও ঘামে আমার শরীর ভিজে যাচ্ছিল। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখটা মুছলাম। কিন্তু রুমালে কোনো ঘামের অস্তিত্ব টের পেলাম না। একদম নিচের ধাপ পর্যন্ত গিয়ে সেখানে বসে আর একটা সিগারেট ধরালাম।

ভাবলাম, আমি কি আমার তিন ফ্লিপারের স্পেসশিপের সঙ্গে এভাবে দেখা করতে চেয়েছিলাম? এ রকম একটা জায়গায়? উত্তরটা নিশ্চয়ই 'না' হবে। এবং স্পেসশিপও নিশ্চয়ই এ রকম একটা জায়গায় আমাকে আবার দেখতে চায়নি। আমাদের সম্পর্কটা সব সময় উষ্ণ। প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা উষ্ণ কোনো আর্কেড সেন্টারে আমরা ডেট করেছি সব সময়। এ রকম মৃত্যুপুরীতে তার সঙ্গে কী কাজ থাকতে পারে আমার?

গুদামের দরজাটা সিঁড়ি দিয়ে নামার আগে ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়েছিলাম। তাই বাইরের পোকামাকড়ের ডাক আর শোনা যাচ্ছিল না। পুরো জায়গাটা আশ্চর্য রকম নীরব হয়ে ছিল। যেন ভারী কুয়াশার মতো নীরবতার একটা চাদর কেউ বিছিয়ে দিয়েছে। ৭৮টা পিনবল মেশিন, তাদের ৩১২টা পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে নিশ্চলভাবে। তাদের কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। পুরো দৃশ্যটা অসম্ভব বেদনাদায়ক।

আমি শিস দিয়ে জাম্পিং উইথ সিম্ফোনি সিডের প্রথম চার লাইন বাজানোর চেষ্টা করলাম। বিশাল গুদামে সেই শিস প্রতিধ্বনিত হয়ে আবার আমার কাছে ফিরে এল। নিজের কানে শুনতে দারুণ লাগল। পরের চার লাইন আবার সুর তুলতে চেষ্টা করলাম। আমি টের পাচ্ছিলাম, আমার চারপাশের সবকিছু কান পেতে আছে সেই সুর শোনার জন্য। তারা যদিও আমার সুরে মাথা নাড়ছে না বা পা দিয়ে তাল দিচ্ছে না, তবু আমি টের পেলাম যে তারা শুনছে। সঙ্গে সঙ্গে আমার শিস বন্ধ হয়ে গেল।

কী ঠান্ডা রে বাবা! কথাটা কেন যেন মুখ ফসকে বেরিয়ে এল।

নিজের গলা নিজেই যেন চিনতে পারছিলাম না। আস্তে করে উঠে দাঁড়ালাম। কাপড় থেকে ধুলো ঝেড়ে হাতের সিগারেটটা পা দিয়ে পিষে নিভিয়ে ফেললাম। নিজেকে প্রশ্ন করলাম, তুমি এখানে কেন এসেছ?

উত্তর এল, পিনবল মেশিনটাকে দেখব বলে।

কিন্তু সেটা না করে চুপচাপ এভাবে বসে থাকার মানে কী?

কিছু ভাবতে পারছিলাম না। তীব্র ঠান্ডায় মাথাটা অবশ হয়ে আসছিল। নিজেকে বোঝালাম, আমাকে পিনবল মেশিনের কথা ভাবতে হবে। আমার সামনে ৭৮টা পিনবল মেশিন পড়ে আছে, সব কটি মৃত। দেয়ালের কোথাও নিশ্চয়ই কোনো একটা সুইচ থাকার কথা, যেটা টিপলেই মেশিনগুলোতে ইলেকট্রিসিটি সংযোগ যাবে। তাদের জীবন ফিরে আসবে। যে করেই হোক, আমাকে সুইচটা খুঁজে বের করতে হবে।

জিনসের পকেটে হাত দিয়ে আমি দেয়াল ঘেঁষে সুইচটা খুঁজতে শুরু করলাম। হাঁটতে হাঁটতে গুদামের একদম অন্যদিকের দেয়ালের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। ঠিক একই রকম দেখতে আর একটা সিঁড়ি আছে সেখানে। আমার মনে হলো, বোধ হয় ভুল করে পুরো একটা চক্কর ঘুরে যে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এসেছিলাম, সেখানে এসে পৌঁছেছি আবার। আসলে সেটা ছিল সম্পূর্ণ অন্যদিকের একটা দেয়াল। সেখানে একটা লোহার নিরেট দরজা। দরজাটা ধাক্কা দিয়ে খোলার চেষ্টা করলাম। সেটা একচুলও নড়ল না। আমি দরজা থেকে হাত সরিয়ে কপালের ঘাম মুছে নিলাম। পুরো বাতাস মুরগির গন্ধে ভারী হয়ে আসছে।

দরজার পাশেই একটা সুইচ দেখতে পেলাম। একটা বেশ বড় ধরনের পুরোনো আমলের সুইচ। একটা বড় লিভারের মতো দেখতে। লিভারটা ধরে টান দিতেই গুদামজুড়ে মৃদু গুঞ্জন শুরু হলো। মনে হলো, দশ হাজার পাখি একসঙ্গে ডানা ঝাপটাচ্ছে। আমি চমকে পেছন ফিরে তাকালাম। ৭৮টা পিনবল মেশিন একসঙ্গে চালু হয়ে গেছে। মেশিনগুলো মৃদু গুঞ্জন তুলে এখন স্কোরবোর্ডগুলো রিসেট করে শূন্যে এসে পৌঁছেছে। পাখির ডানা ঝাপটানোর আওয়াজটা বদলে গিয়ে এখন মৌমাছির মৃদু গুঞ্জনের মতো মনে হলো। একসঙ্গে ৭৮টা পিনবল মেশিন যেন জীবন ফিরে পেয়েছে। সবগুলো মেশিনে উজ্জ্বল রঙিন বাতি জ্বলছে।

একজন আর্মি জেনারেল যেভাবে তার প্যারেড পরিদর্শন করে, সেভাবে আমি মেশিনগুলোর সামনে দিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে গেলাম। সেখানে অনেক পুরোনো কিছু মেশিন দেখলাম আগে যা শুধু ছবিতেই দেখেছিলাম। কিছু মডেল দেখলাম আমার বেশ পরিচিত, সেগুলোতে আমি খেলেছি। আর কিছু মডেল কবেকার

তার কোনো কিনারা করতে পারলাম না। ছবিতেও কখনো দেখিনি।

সে রকম একটা মেশিনের গায়ে লেখা 'ফ্রেন্ডশিপ ৭', প্রস্তুতকারক হিসেবে উইলিয়ামস কোম্পানির নাম লেখা আছে। আরেকটা মেশিন দেখলাম, যার ওপরে লেখা 'গ্র্যান্ড ট্যুর' (বেলি ১৯৬৪ কোম্পানির), সেখানে আইফেল টাওয়ার আর নীল আকাশের ছবি আঁকা। কিছু আমেরিকান ট্যুরিস্ট আইফেল টাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে হাসছে। 'কিংস অ্যান্ড কুইনস' (গোটালিব কোম্পানির) বলে আরেকটা মেশিন ছিল, যেখানে বলগুলো ঘোরার জন্য মোট আটটা লেন। মেশিনটার ওপর সালভাদর দালির মতো মোচওয়ালা এক জুয়াড়ির ছবি আঁকা। তার চুলগুলো আর্মিদের মতো ছোট ছোট করে ছাঁটা। স্পেডের টেক্কা হাতে পা দুটো ফাঁক করে আয়েশি ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে সে।

সব কটি মেশিনেই কোনো না কোনো ছবি জুড়ে দেওয়া। সুপারম্যান, স্পাইডারম্যান, দৈত্য-দানব, ফুটবল, রকেট আর মেয়েদের ছবি। বিভিন্ন ধরনের মেয়ের ছবি আঁকা সেখানে। সোনালি চুলের ব্লন্ড, বিকিনি পরা মেক্সিকান মেয়ে, ক্লিভেজ বের করা ফরাসি কোনো সুন্দরী, অড্রে হেপবার্ন, মেরিলিন মনরো সবাই তাদের স্তনের কিছুটা অংশ অনাবৃত রেখে মোহময় ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

সারিটার একদম শেষ মাথায় গিয়ে আমার তিন ফ্লিপারের স্পেসশিপের দেখা পেলাম। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল শান্ত সমাহিত। উগ্র কোনো সাজগোজ নেই, একধরনের প্রশান্তির প্রতিমূর্তি। অন্য সব পিনবল মেশিনের তুলনায় তার চেহারা বেশ ম্লান দেখাচ্ছে। তার চারপাশে সহোদর বোনেরা সবাই বেশ জমকালো সাজগোজ করে দাঁড়িয়ে আছে। অথচ সে কোনো সাজগোজ করেনি। মলিন মুখে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল।

আমি তার ঠিক সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। আগের মতোই মহাকাশের ছবি তার গায়ে। নীল রং জ্বলজ্বল করছে আকাশে। মনে হচ্ছে কেউ সেখানে নীল রঙের এক দোয়াত কালি ঢেলে দিয়েছে। ছোট ছোট তারার রং সাদা। তিনটা গ্রহ আছে সেখানে। শনি, মঙ্গল আর শুক্র। আকাশের বুকে একটা সাদা রঙের স্পেসশিপ ভাসছে।

আলো পড়ে স্পেসশিপের জানালার রং যেন কিছুটা জ্বলে গেছে।

মেশিনটার ভেতরের সবকিছু ঠিক আগের মতো। ফিল্ডের রং গাঢ় নীল। টার্গেটগুলো ঝকঝকে সাদা। যেন কেউ ঠোঁট দুটো ফাঁক করে হাসছে আর

ভেতরের সাদা দাঁত ঝকঝক করছে। বোনাস লাইটগুলো হলুদ রঙের।

কেমন আছ? আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম।

কথাটা মুখ ফুটে বলিনি তবু আমি অনুভব করলাম, কথাগুলো কোনো না কোনো উপায়ে তার কাছে গিয়ে পৌঁছেছে। আমি দুই হাতে কাচের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। বরফের মতো ঠান্ডা কাচ। যখন থেকে হাত সরালাম, দশটা আঙুলের দাগ সেখানে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। দাগগুলো যেন মেঘের মতো জমে ছিল। অনেকক্ষণ পরে সে যেন ঘুম থেকে জাগল। আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। এই হাসি আমি কতদিন দেখিনি!

কতদিন পর তোমাকে দেখলাম! সে বলল।

আমি মনে মনে একবার গুনে নিলাম। বললাম, তিন বছর। চোখের পলকে তিনটা বছর কেটে গেছে।

আমরা দুজন দুজনের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে ছিলাম, কোনো কফিশপে মুখোমুখি বসে যেন দুজনে কফি খাচ্ছি।

তোমার কথা অনেকবার মনে পড়েছে, আমি বললাম।

কখন মনে পড়েছে? সে বলল, যখন তোমার ঘুম আসত না?

ঠিক ধরেছ।

তোমার কি শীত লাগছে? কাঁপছ কেন?

একেবারে জমে যাচ্ছি।

বেশিক্ষণ থেকো না তাহলে। জায়গাটা অনেক বেশি ঠান্ডা। সহ্য করতে পারবে না।

সে রকমই মনে হচ্ছে, আমি বললাম।

আসলেই আমার হাতগুলো ঠান্ডায় কাঁপছিল। পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরালাম।

খেলবে না আজ? সে জানতে চাইল।

না, আমি বললাম।

কেন?

আমার হায়েস্ট স্কোর কত তোমার মনে আছে?

আছে।

কত?

১৬৫,০০০, সে বলল।

বাহ, আমি বললাম, কিছুই ভুলে যাওনি দেখছি।

এটা কি ভুলে যাওয়ার মতো ব্যাপার? ওটা তোমার যেমন হাইয়েস্ট স্কোর, তেমনি আমারও। এর চেয়ে বেশি কেউ করতে পারেনি।

আমি সেই স্মৃতিটুকু মনে রাখতে চাই। আজ যদি খেলি, সেই স্মৃতিটা নষ্ট হয়ে যাবে। সেটা নষ্ট হতে দেব না।

সে কোনো কথা বলল না। চুপচাপ আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি একা একা সিগারেট টানলাম।

তুমি কেন এসেছ? সে জানতে চাইল।

তোমার ডাক শুনতে পেলাম যে, বললাম আমি।

আমি ডেকেছি? কথাটা বলেই সে লজ্জায় লাল হয়ে গেল। বলল, বোধ হয় ডেকেছি।

তোমাকে অনেক খুঁজেছি এই কটা বছর, বললাম আমি, খুঁজেই পেলাম না।

তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু তুমি কিছুক্ষণ পরপর চুপ হয়ে যাচ্ছ। চুপ থাকা যাবে না। কথা বলো। তোমার কথা শুনতে ইচ্ছে করছে খুব।

ওদিকে অনেক কিছু বদলে গেছে তুমি জানো? পুরোনো গেম সেন্টারটা ওরা তুলে দিয়েছে। তার বদলে সেখানে একটা ডোনাটের দোকান বসেছে। সে দোকানের কফি খুবই জঘন্য। তুমি যদি খাও, তোমার বমি হয়ে যেতে পারে।

এতটা খারাপ?

তোমার পুরোনো ডিজনি ছবির কথা মনে আছে? একটা জেব্রার খুব পিপাসা লেগেছিল। সে প্রচণ্ড তৃষ্ণার্ত হয়ে পানি খুঁজে বেড়াল। তারপর সে ঘুরতে ঘুরতে একসময় একটা গর্ত খুঁজে পেল। সেখানে কাদার মধ্যে ঘোলা পানি জমে ছিল। ডোনাট শপের কফির রং ঠিক সে রকম।

কথাটা শুনে সে মৃদু হাসল। হাসলে তাকে আসলেই খুব সুন্দর দেখায়।

এখন তুমি কী করছ? সে জানতে চাইল।

অনুবাদের কাজ করি, আমি বললাম।

কী অনুবাদ করো? গল্প-উপন্যাস?

না। আজেবাজে যত জিনিস। মাঝেমধ্যে মনে হয়, অর্থহীন কিছু কথাকে এক ভাষা থেকে টেনে নিয়ে আরেক ভাষায় ফেলছি।

কাজটা কি করতে তোমার ভালো লাগছে না?

ভালো লাগার মতো কোনো কাজ?

তাহলে করছ কেন?

আর কিছু যে করতে পারলাম না।

হুমম, সে বলল, কোনো গার্লফ্রেন্ড হয়েছে তোমার?

বললে তুমি বিশ্বাস করবে না, আমি বললাম, এই মুহূর্তে এক জোড়া যমজ বোনের সঙ্গে এক বাসায় থাকছি। পৃথিবীতে কফি বানানোর কোনো প্রতিযোগিতা হলে তারা ফার্স্ট প্রাইজ পাবে। শুধু ফার্স্ট না, সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ ... সব পুরস্কার দুই বোন মিলে নিয়ে নেবে।

সে মৃদু হাসল। হাসিটা ঠোঁটে লেগে রইল। বলল, তোমার কি পুরোনো দিনের কথা ভেবে মন খারাপ হয়?

আমি চুপ করে রইলাম।

আবার কিন্তু চুপ করে গেলে, সে বলল, এমন কিন্তু কথা ছিল না।

হয়, আমি বললাম।

আমারও হয়। মাঝেমধ্যে মনে হয়, যে দিনগুলো কাটিয়েছি সবই বোধ হয় মিথ্যে।

কিছুই মিথ্যে না। দিনগুলো সত্যিই তখন ছিল। এখন আর নেই। কোনো শূন্য জায়গা থেকে এসে আবার সেই শূন্যে গিয়ে হারিয়ে গেছে।

আমরা দুজনেই আবার চুপ হয়ে গেলাম। স্মৃতি কখনো মরে যায় না। অতীত থেকে এক উজ্জ্বল আলোর মতো ভেসে এসে আমাদের মনকে রাঙিয়ে দিয়ে যায়। মৃত্যুর আগপর্যন্ত আমরা সেই আলো ধরার চেষ্টা করি। ধরতে পারি না। তখন আমাদের ভেতরটা ফাঁকা ফাঁকা লাগে।

তোমার এখন চলে যাওয়া উচিত, সে বলল।

আমি কিছু বলতে পারলাম না। চুপ করে ঠান্ডায় যেন জমে গেলাম।

আমাকে দেখতে আসার জন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, সে বলল, সম্ভবত আমাদের আর কখনো দেখা হবে না। ভালো থেকো তুমি।

তুমিও ভালো থেকো, বললাম আমি।

পিনবল মেশিনের সারিগুলোর মধ্য দিয়ে আমি খুব ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলাম। একটা একটা করে পা গুনে হাঁটলাম। দেয়ালের কাছে ফিরে গিয়ে লিভারটা আবার নিচে নামিয়ে দিলাম। মেশিনের গুঞ্জন থেমে গেল। পুরো জায়গাটা আবার আগের মতো ঘুমিয়ে পড়ল। বেলুন ফুটো করে বাতাস বের

করে দেওয়া হলে যে রকম হয়, ভেতরটা সে রকম লাগছিল আমার।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে গিয়ে আমি গুদামের দরজার কাছে দাঁড়ালাম। লাইটের সুইচটা বন্ধ করে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। পেছন ফিরে তাকালাম না। একবারের জন্যও না।

ট্যাক্সি খুঁজে অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছাতে পৌঁছাতে মাঝরাত পার হয়ে গেল। যমজ বোনেরা ততক্ষণে বিছানায় শুয়ে পড়েছে। আমি ঠান্ডায় একদম জমে গিয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল, গুদামঘরে ফ্রিজ করে রাখা একটা মুরগি। মুখটা একেবারে সাদা হয়ে গিয়েছিল। জামাকাপড় খুলে সেগুলোকে ওয়াশিং মেশিনের ভেতর ছুড়ে মেরে বাথরুমে গিয়ে গরম পানির নিচে দাঁড়ালাম। একটা লম্বা গোসল দিলাম। প্রায় ত্রিশ মিনিট ধরে গরম পানিতে ভেজার পর মনে হলো, আমি আবার মুরগি থেকে মানুষে পরিণত হয়েছি।

যমজ বোনেরা ক্লজেটের ভেতর থেকে গ্যাস হিটারটা বের করে বাইরে এনে সুইচ অন করে দিল। প্রায় পনেরো মিনিট লাগল আমার কাঁপুনি থামতে। এক বাটি অনিয়ন স্যুপ পেটে পড়ার পরে মনে হলো সব আস্তে আস্তে ঠিকঠাক হচ্ছে।

সে রাতে স্বপ্নে রেড স্কয়ারের চারটা বলগা হরিণ দেখলাম। ট্রটস্কির সেই বিখ্যাত বলগা হরিণ। হরিণগুলো উলের মোজা পরে আছে। তারা বরফের মধ্যে দৌড়াচ্ছে। বরফের টুকরো মিহি দানার মতো ছড়িয়ে যাচ্ছে। স্বপ্নের মধ্যেই আমার তীব্র ঠান্ডা বোধ হলো।

২৩

মেয়েটার সঙ্গে র‍্যাটের আর কখনো দেখা হয়নি। তার অ্যাপার্টমেন্টের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকাটাও সে একেবারে বন্ধ করে দিল। সত্য কথা বলতে কি, তার বাসার আশপাশের কোনো রাস্তায়ও সে আর গেল না। মোমবাতি নিভে যাওয়ার পরে সাদা ধোঁয়া যেমন একটু একটু করে অদৃশ্য হয়ে যায়, সেভাবেই তার হৃদয় থেকে স্মৃতিগুলো একটু একটু করে মুছে দেওয়ার চেষ্টা করল সে। এরপর অন্ধকার, শুধুই নীরবতা।

জীবনকে যদি খোসার মতো একটু একটু করে ছাড়ানো যায়, শেষ পর্যন্ত কী বাকি থাকে। অহংকার? একটা মানুষ সম্ভবত তার অহমিকাটুকু ছাড়া বেঁচে থাকতে পারবে না। কিন্তু শুধু অহংকার নিয়ে বেঁচে থাকাও একধরনের অন্ধকারে বেঁচে থাকা। নিকষ কালো আঁধার।

র‍্যাট ভেবেছিল কাজটা অনেক কঠিন হবে। কিন্তু আসলে মেয়েটার সঙ্গে সম্পর্ক ভেঙে দেওয়ার ব্যাপারটা খুব সহজ ছিল। সে প্রথমে মেয়েটাকে ফোন করা বন্ধ করে দিল। প্রতি শুক্রবার রাতে সে মেয়েটাকে ফোন করত। শুক্রবার কথা বলে শনিবারে কখন কোথায় দেখা করবে সেটা ঠিক করে নিত। এক শুক্রবার রাতে সে ফোন করল না।

র‍্যাটের মনে নানা ভাবনা এল সে রাতে। একটার পর একটা সিগারেট ধরিয়ে ভাবল, মেয়েটা বোধ হয় অনেক রাত পর্যন্ত ফোনের জন্য অপেক্ষা করে আছে। ভাবনাটা তাকে ভয়াবহ যন্ত্রণা দিল। বারবার তার ফোনের দিকে ছুটে যেতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু সে নিজেকে আটকাল। একবার ভয় হলো, যদি মেয়েটা তাকে নিজে থেকে ফোন দেয় তখন সে কী করবে! যদিও সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্নটার উত্তর পেয়ে গেল। আসলে সে জানত, মেয়েটা কখনোই তাকে ফোন দেবে না। তার পরও সে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়ে রাখল। হেডফোন কানে দিয়ে সে ফুল ভলিউমে রেকর্ড প্লেয়ার বাজিয়ে দিল। ফোন যদি বেজে ওঠে সে শুনতে পাবে না।

র‍্যাট গান শুনছিল ঠিকই, কিন্তু তার মনজুড়ে ছিল মেয়েটা। সে মেয়েটাকে কল্পনায় দেখতে পেল। একটা ম্যাগাজিন হাতে বসে আছে। মাঝে মাঝে টিভিতে চোখ পড়ছে তার। মধ্যরাত পর্যন্ত সেভাবেই বসে রইল। র‍্যাটের ফোনের জন্য অপেক্ষা করল। তারপর হাত-মুখ ধুয়ে দাঁত ব্রাশ করে সোজা বিছানায় চলে গেল।

ঘুমিয়ে যাওয়ার ঠিক আগে মেয়েটা হয়তো ভাবল, র‍্যাট কাল সকালে ফোন দেবে। কিন্তু পরদিন সকালেও মেয়েটার ফোন বাজল না। তখন সে নানান ধরনের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ার চেষ্টা করল। র‍্যাট কল্পনায় পুরোটাই দেখতে পেল। হয়তো সে জানালা খুলে সোজা কিচেনে ঢুকে গেছে। সেখানে ব্রেকফাস্ট তৈরি করছে। অথবা টবের গাছগুলোতে পানি দিচ্ছে। সকালে মানুষের কাজ থাকবে না?

পুরোটা সময় র‍্যাট জানালার পর্দাটা নিচে নামিয়ে ঘর অন্ধকার করে বসে

রইল। কিছুক্ষণ পরপর দেয়ালঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিল। ঘরজুড়ে বাতাস যেন স্থির হয়ে আছে। এভাবে বসে থাকতে থাকতে একসময় সে বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। ছাড়া ছাড়া ঘুমের মধ্যে সে বিক্ষিপ্ত কিছু স্বপ্ন দেখল। র‍্যাট অনুভব করল, তার শরীরের ওপর নিজের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, ওজনহীন এক জড়বস্তুতে পরিণত হয়েছে সে। কোনো অনুভূতি টের পাচ্ছে না। যখন সবকিছু খুব অসহ্য মনে হলো, উঠে গিয়ে বাথরুমে ঢুকল। গোসল করে দাড়ি কামাল।

ফ্রিজ থেকে এক গ্লাস অরেঞ্জ জুস বের করে এক চুমুকে শেষ করল। লকার খুলে একদম নতুন ভাঁজ করা একটা পায়জামা বের করল। সেই পায়জামা পরে আবার বিছানায় চলে গেল। তার মনে হলো সে সম্ভবত সবকিছুর একধরনের সমাপ্তি টানতে পেরেছে। ভাবনাটা একধরনের স্বস্তি এনে দিল। এবার তার দুচোখ ভরে ঘুম নামল। গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল সে।

২৪

সন্ধ্যা ছয়টা বাজে। বার মাত্র খুলেছে। তখনো কোনো কাস্টমার আসেনি। জে কাউন্টার ঘষামাজা করে পরিষ্কার করছে। অ্যাশট্রেগুলো থেকে সিগারেটের টুকরো ফেলে দিয়ে সেগুলোকে টেবিলে নিয়ে রাখছে। শেলফে মদের বোতলগুলো থেকে কাল্পনিক ধুলো ঝেড়ে বোতলের লেভেলগুলো এমনভাবে রাখছে যেন কাস্টমার টেবিল থেকে খুব সহজেই মদের ব্র্যান্ডের নাম পড়া যায়।

জে-র কাছ থেকে নেইল কাটার চেয়ে নিয়ে নখ কাটায় মন দিল র‍্যাট। ওকে দেখে মনে হচ্ছিল, সেটা পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বাঁ হাতের নখ কেটে অ্যাশট্রেতে জমা করল।

আমি শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছি, নিরাসক্ত একধরনের গলায় র‍্যাট বলল।

চলে যাচ্ছ! মানে কোথায় যাচ্ছ? জে বলল।

এখনো জানি না। নতুন কোনো জায়গায় যাওয়ার ইচ্ছে আছে। সম্ভবত ছোট কোনো অচেনা শহরে চলে যাব।

জে তখন সালাদের জন্য আদা কাটছিল। বাতাসে আদার গন্ধ কুয়াশার

মতো ঝুলে আছে।

তুমি সেখানে গিয়ে কী করবে? জে জানতে চাইল।

কিছু একটা করব, র‍্যাট জবাব দিল।

সেটা কী?

কোনো একটা চাকরিবাকরি খুঁজে নেব।

চাকরি তো এখানেও খুঁজে নিতে পারো। এই জায়গাটায় সমস্যা কী?

সমস্যা কিছু নেই। তবে আমার কোনো উপায় নেই। এই শহরটা আমাকে ছাড়তে হবে। জায়গাটা পচে গেছে। অন্তত আমার জন্য। পচেগলে শেষ। এখন গন্ধ বের হচ্ছে। আমাকে একটা বিয়ার দিতে পারবে?

পারব না কেন? বলে জে একটা বিয়ারের বোতল র‍্যাটের দিকে বাড়িয়ে দিল। তারপর কিছুই হয়নি এমন ভঙ্গিতে সে আবার নিজের কাজে মন দিল।

র‍্যাট দীর্ঘ সময় ধরে গ্লাসে বিয়ার ঢালল।

তোমার কি আর কিছু জানতে ইচ্ছে করছে না, র‍্যাট বলল, এই শহরটা কেন আমাকে ছাড়তেই হবে?

সম্ভবত আমি জানি, জে বলল।

র‍্যাট একধরনের কৈফিয়তের মতো করে বলতে শুরু করল, আসলে এখানে আমার কিছু হচ্ছে না। এই যে তুমি বললে, সম্ভবত আমি জানি। কথাটা কিন্তু মিথ্যে বলোনি। এই শহরে আমরা সবাই সবাইকে জানি। সবাই এখানে একই রকমের কথাবার্তা বলে। একই বিষয়ে কথা বলে। একই চিন্তা করে। এখানে প্রশ্ন করে কোনো কিছু জেনে নিতে হয় না। আমরা একধরনের মুখস্থ জীবন যাপন করছি। মনে হচ্ছে আমি একটা দীর্ঘ সময় ধরে এই পৃথিবীর মধ্যে আটকা পড়ে আছি। একটা মাত্র বই বারবার পড়ছি।

হতে পারে।

আমি পুরো বিষয়টা নিয়ে অনেক ভেবেছি। অন্য কোনো শহরে গেলে পরিস্থিতি যে অন্য রকম কিছু হবে তা কিন্তু না। সেখানেও কিছুদিন থাকার পর আবার সেই মুখস্থ জীবনে ফিরে যেতে হবে। তবু আমাকে এই শহর ছাড়তে হবে।

চিরদিনের জন্য যাচ্ছ? আর কখনো ফিরবে না?

নিশ্চয়ই ফিরব। কোনো না কোনো দিন ফিরতে আমাকে হবেই। এমন না যে আমি কোনো কিছু থেকে পালাচ্ছি।

কথাটা বলে র‍্যাট বাটি থেকে কয়েকটা বাদাম নিয়ে মুখে দিল। কাউন্টারের ওপর ঠান্ডা বিয়ারের গ্লাসের দাগ পড়েছিল। একটা ন্যাপকিন তুলে নিয়ে সেই দাগ একটু একটু করে ঘষে তোলার চেষ্টা করল।

তো কখন যাচ্ছ? জে জানতে চাইল?

বলতে পারছি না, র‍্যাট বলল, আগামীকাল হতে পারে, পরশুও হতে পারে। তবে তিন দিনের মধ্যেই যাব। এর বেশি থাকা সম্ভব না। আমার সবকিছু গোছানো শেষ।

একটু বেশি তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?

তা হচ্ছে।

দুজনেই চুপচাপ রইল কিছুক্ষণ। স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক ধীরগতিতে সে বিয়ারের গ্লাসটা তুলে মুখের কাছে নিল। তারপর চুমুক না দিয়ে আবার কাউন্টারে রেখে দিল।

তোমাকে প্রচুর জ্বালিয়েছি এই কয়েকটা বছর, র‍্যাট বলল, আর জ্বালাব না।

হ্যাঁ অনেকগুলো বছর, জে বলল, তোমরা যখন হাইস্কুলে পড়ো সেই তখন থেকে চিনি। কিন্তু সবকিছু যেহেতু শেষই হয়ে যাচ্ছে, তুমি চলে যাচ্ছ, সুতরাং এটা একটা স্মৃতি হিসেবে হয়তো থেকে যাবে। স্বপ্নও বলতে পারো।

তোমার কথা সম্ভবত সত্যি। কিন্তু তোমার মতো করে আমি ভাবতে পারি না।

ভাবতে পারার কথাও না। জেনারেশন গ্যাপ বলে একটা ব্যাপার তো পৃথিবীতে আছে। আমি মাঝেমধ্যে ভুলে যাই যে আমাদের দুজনের বয়সের ব্যবধান বিশ বছর।

র‍্যাট তার বোতলের বাকি বিয়ারটুকু গ্লাসে ঢেলে চুমুক দিল। সারা জীবনে বোধ হয় এত ধীরে ধীরে আর কখনো বিয়ার খায়নি।

আর একটা দেব? জে জানতে চাইল।

র‍্যাট মাথা নেড়ে বলল, না ঠিক আছে। এখন যে বিয়ারটা খাচ্ছি, সেটা আমার খাওয়া শেষ বিয়ার হবে, এ রকম একটা প্ল্যান আছে আমার। তাই ইচ্ছে করেই ধীরে খাচ্ছি। তুমি আবার ভেবে বসো না যে এটা জীবনেরই শেষ বিয়ার। তোমার এখানে খাওয়া আমার শেষ বিয়ার।

তুমি সত্যিই আর কখনো এখানে আসবে না?

সে রকমই আমার প্ল্যান। যদিও বিষয়টা খুব কঠিন হয়ে যাবে। অসম্ভবই বলা যেতে পারে।

জে হেসে বলল, আমাদের আবার দেখা হবে।

অনেক ... অনেক বছর পরে হয়তো। সেবার তুমি আমাকে বোধ হয় চিনতে পারবে না, র‍্যাট বলল।

আমি তোমার গন্ধ শুঁকে চিনে নেব।

র‍্যাট অনেকক্ষণ তার কেটে রাখা নখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল।

অন্ধকারের বুক চিরে নিঃশব্দে বাতাস বয়ে যাচ্ছে। র‍্যাট কবরস্থানের পাশে পাইনবনে গাড়িটা পার্ক করল। গাছের কিছু পাতা এসে তার গাড়ির ছাদে পড়ল। বয়ে যাওয়া বাতাসে পাতাগুলো নিজের মতো করে কিছুক্ষণ নাচানাচি করে গাড়ির উইন্ডশিল্ডের ওপর দিয়ে গড়িয়ে গেল।

র‍্যাট গাড়ির মধ্যে বসে শূন্য দৃষ্টিতে সামনে তাকিয়ে ছিল। যে জায়গায় গাড়ি পার্ক করেছিল, তার ঠিক সামনে খাড়া ঢাল। পাহাড়টা যেন সেখানে এসে শেষ হয়ে গেছে। দূরে সমুদ্র আর আকাশ একসঙ্গে গিয়ে মিশেছে। নিচে শহরের আলোগুলো মিটমিট করে জ্বলছে। এই পরিচিত দৃশ্য সে আর দেখতে পাবে না। হাত দুটো গাড়ির স্টিয়ারিংয়ে রেখে সে একটু সামনে ঝুঁকে এল। চোখ দুটো আকাশের একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে স্থির করল। মনে মনে বিন্দুটাকে স্বর্গের একটা জায়গা বলে ধরে নিল। তার দুই আঙুলে একটা সিগারেট ধরা। সেটায় আগুন ধরানো হয়নি।

জে-র সঙ্গে কথা বলার পর থেকে তার নিজের ভেতরটা একদম ফাঁকা লাগছে। এমনটা হবে সে বুঝতে পারেনি। এত দিন সে আসলে বিষয়টার ভেতরে ঢুকতে পারেনি। এখন জে-কে বলার পর বুঝতে পারছে, আসলেই সময় হয়ে এসেছে। এবার তাকে চলে যেতে হবে এই শহর ছেড়ে।

এত দিন পর্যন্ত তার ভেতরে চেতনার নদীগুলো একই দিকে প্রবাহিত হচ্ছিল। এবং এই নদীর প্রবাহ তাকে শক্ত করে ধরে রেখেছিল। শহর ছেড়ে দেবে কথাটা বলার পরে এই নদীর প্রবাহগুলো যেন দিক পরিবর্তন করে বিভিন্ন দিকে বইতে শুরু করেছে। তাই এখন নির্দিষ্ট করে কোনো কিছু আর ভাবতে পারছে না। চেতনার ওই প্রবাহগুলো হয়তো আলাদা দিকে বইতে বইতে একসময় গিয়ে সীমাহীন সমুদ্রে গিয়ে মিশবে। র‍্যাট কখনোই আর সেগুলোর নাগাল পাবে না। জীবনের পঁচিশটা বছর শেষে র‍্যাট কি এ রকম

কিছু চেয়েছিল?

প্রশ্নটা সহজ, কিন্তু কোনো উত্তর তার জানা নেই। সহজ প্রশ্নগুলোর কখনো কোনো উত্তর থাকে না।

বাতাসের বেগ বাড়ছে। র‍্যাট স্টিয়ারিং হুইল থেকে তার হাত দুটো সরাল। হাতের আঙুলগুলোর মধ্যে সিগারেটটা কয়েকবার ঘোরানোর পর হুট করে যেন মনে পড়ল, সেটায় আগুন ধরানো যেতে পারে। সিগারেটটা ঠোঁটে রাখল সে। আগুন ধরিয়ে একগাল ধোঁয়া ছাড়ল।

তার মাথা ব্যথা করছিল। নিজের মধ্যে এক অদ্ভুত অনুভূতি টের পেল। মনে হচ্ছিল, ঠান্ডা আঙুল দিয়ে কেউ বোধ হয় তার মাথাটাকে চেপে ধরেছে। জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে সে তার সব ভাবনা ঝেড়ে ফেলতে চাইল। নিজের হাতে সবকিছু শেষ করে দেওয়ার পর এখন আর ভাবনার কোনো সুযোগ নেই। সিদ্ধান্ত যা নেওয়ার নিয়ে ফেলেছে সে।

গাড়ির গ্লোব কম্পার্টমেন্ট থেকে সে একটা মানচিত্রের বই বের করল। সেটা খুলে নিজের কোলের ওপর রাখল। ম্যাপ থেকে কয়েকটা জায়গার নাম সে বিড়বিড় করে পড়ার চেষ্টা করল। সে যে নামগুলো পড়ল, অধিকাংশই অপরিচিত কিছু ছোট শহরের নাম। বইয়ের কয়েকটা পাতা ওল্টানোর পর ক্লান্তি এসে পেয়ে বসল তাকে। অবসাদের পাহাড়সমান একটা ঢেউ এসে যেন আছড়ে পড়ল তার ওপর।

সে ঘুমোতে চাইল। একটু শুধু ঘুম। ব্যস, তার সমস্ত ক্লান্তি হয়তো কেটে যাবে। সে যদি শুধু একটু ঘুমোতে পারত...!

চোখ দুটো বন্ধ করল সে। দূর থেকে আসা সমুদ্রের গর্জন তার কানে ভেসে এল। উত্তাল ঢেউ এসে জাহাজ ঘাটার ভেতরে ঢুকে দুপাশের কংক্রিটের দেয়ালে বাড়ি খাচ্ছে। তারপর আবার খোলা সাগরে ফিরে যাচ্ছে।

অন্তত আমার আর অন্য কারও কাছে নিজেকে ব্যাখ্যা করতে হবে না, র‍্যাট নিজেকে বোঝাল।

তার সত্যিই আর হারানোর কিছু নেই। যেন সাগরের একদম তলায় পৌঁছে গেছে। সাগরের একদম তলদেশ নিশ্চয়ই পৃথিবীর যেকোনো শহরের চেয়ে বেশি শান্তিপূর্ণ এবং শান্ত। তাহলে তার আর ভয় কীসের? অন্য কথাই-বা সে ভাবছে কেন?

২৫

আমার হারানো জিনিসের তালিকায় আরও একটা জিনিসের নাম উঠে গেল পাকাপাকিভাবে। জীবন থেকে পিনবল মেশিন চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেল। সেদিনের পর কখনো আর স্পেসশিপের ডাক শুনতে পাইনি। আমার কাছে মনে হচ্ছিল, আমার আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই, কিছু হারানোর নেই।

রজার গ্রিনের শিশুদের জন্য লেখা উপন্যাস *কিং আর্থার অ্যান্ড হিজ নাইটস অব দ্য রাউন্ড টেবিল*-এর কথা মনে পড়ছিল বারবার। সেই উপন্যাসে ফাইনাল ক্লাইম্যাক্স বলে একটা জিনিস আছে। সে রকম কোনো চূড়ান্ত পরিণতির দিকে আমি যাইনি, সেটা তখনো অনেক দূরের পথ।

তবু যে ঘোড়ার পিঠে চড়ে আমি দৌড়াচ্ছিলাম, সেটা যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ল। আমার হাতের তরবারি ভেঙে গেল, শরীরের বর্ম আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হলো। আমার মনে হচ্ছিল, একটা সবুজ ঘাসের মাঠে গিয়ে শুয়ে পড়ি। এবং সেখানে শুয়ে বাতাসের গান শুনি। কোথাও সবুজ মাঠ খুঁজে না পেলে আমি সুইচ প্যানেলটার সঙ্গে লেকের পানির নিচে গিয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকতে পারব। পথ যদি আমাকে নিয়ে যায়, স্পেসশিপের সঙ্গে গুদামঘরের তীব্র ঠান্ডায় গিয়ে বসে থাকতেও আমার আপত্তি নেই।

এখন আমি সংক্ষেপে গল্পটার একটা সমাপ্তি টানব। আমি জানি যে আপনারা বলবেন, এটা তো খুব গতানুগতিক একটা সমাপ্তি হয়ে গেল। এর মধ্যে আলাদা কিছু কোথায়? সমস্যাটা হলো, আমার জীবনে আলাদা কিছু না ঘটলে বানিয়ে বানিয়ে যে কিছু একটা বলে দেব, সে রকম সৃষ্টিশীলতা আমার মধ্যে নেই। হতাশ করার জন্য অগ্রিম ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

যমজ দুই বোন একদিন সুপারমার্কেট থেকে একটা অদ্ভুত জিনিস নিয়ে এল। আসলে সে অর্থে অদ্ভুতও না। জিনিসটা হলো, এক বাক্স কটন-বার যা কান খোঁচানোর জন্য ব্যবহার করা যাবে। বাক্সটার মধ্যে প্রায় তিনশ কান খোঁচানো কাঠি। কেনার পর জিনিসটা বাসায় ফেলে রাখার কোনো মানে নেই। এরপর থেকে প্রতিদিন আমি গোসল করে আসার পর দুই বোন মিলে আমার কান পরিষ্কার করে দিত।

তারা যখন কাজটা করত, আরামে আমি চোখ প্রায় বন্ধ করে ফেলতাম।

মাঝেমধ্যে চোখ বন্ধ করেই বিয়ারের ক্যানে চুমুক দিতাম। এক রাতে ছোট্ট একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। তারা দুবোন মিলে আমার দু-কানে কাঠি ঢুকিয়েছে। আমি জোরে একটা হাঁচি দিয়ে বসলাম। এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, আমি বোধ হয় শ্রবণশক্তি হারিয়ে ফেলেছি। কানে কিছু শুনতে পাচ্ছিলাম না।

তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? ডান পাশের মেয়েটা জানতে চাইল।

একটু একটু পাচ্ছি, বললাম আমি।

আমার কথা শোনা যায়? বাঁ পাশের মেয়েটা বলল।

একটু।

তুমি হাঁচি কেন দিতে গেলে?

এটা পুরোপুরি তোমার দোষ।

আমার দোষ? আমি অবাক হয়ে তাকালাম।

হ্যাঁ, তোমার দোষ।

কান খোঁচানোর সময় হাঁচি দেওয়াটা বোকামি।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

তুমি কি একটু পানি খেতে চাও? তাদের একজন বলল।

পানি খেলে সম্ভবত তোমার ভালো লাগবে, অন্যজন সুর মেলাল।

সে সম্ভাবনা খুবই কম, আমি বললাম।

তার পরও তারা জোর করে আমাকে প্রায় এক বালতি পানি খাওয়াল। কানের অবস্থার বিশেষ কোনো উনিশ-বিশ তাতে হলো না। উল্টো পেটে ব্যথা শুরু হয়ে গেল, মনে হচ্ছিল, পেট ফেটে পানি বেরিয়ে যাবে।

কানের মধ্যে কোনো ব্যথা টের পাচ্ছিলাম না অবশ্য। সম্ভবত দুই বোন মিলে কানের মধ্য থেকে যে ময়লাগুলো বের করছিল, হাঁচি দিয়ে সেগুলোকে আমি কানের একটা দুরূহ কোণের ভেতর আটকে ফেলেছি। ময়লাগুলো কানের পর্দাটাকে এখন আড়াল করে দিয়েছে। শব্দ সে পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে না। এ ছাড়া কানে না শোনার কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আমি ক্লজেট থেকে ফ্লাশলাইট বের করে আনলাম এবং দুই বোনকে বললাম লাইট মেরে কানের ভেতরটা ভালো করে দেখতে। তারা অনেকক্ষণ ধরে উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখল।

কিছুই দেখা যাচ্ছে না, একজন বলল।

একেবারে পরিষ্কার, কোনো ময়লা নেই, অন্যজন সুর মেলাল।

তাহলে আমি কানে শুনতে পাচ্ছি না কেন? চিৎকার করে বললাম।

হতে পারে, তোমার কানগুলো মরে গেছে।

সুইচ প্যানেলের মতো।

ওরা অনেক দিন বেঁচে ছিল। এখন এক্সপায়ার ডেট চলে এসেছে।

তুমি কালা হয়ে গেছ। এখন আর কানে শুনবে না।

দুই বোনের কথা শুনে পেটব্যথার সঙ্গে মাথাব্যথাও শুরু হয়ে গেল। তারা যখন স্টেরিও স্পিকারের মতো বাম-ডান-বাম-ডান করে বেজে যাচ্ছিল, তখন উঠে দাঁড়ালাম। তাদের কথায় কান না দিয়ে টেলিফোন ডিরেক্টরি ঘেঁটে পাশের একটা ক্লিনিকে ফোন দিলাম। টেলিফোনে আমার অবস্থাটা বুঝিয়ে বলা মোটেই সহজ কাজ ছিল না। কিন্তু যে নার্স ফোন ধরেছিল, তাকে বেশ নরম-সরম এবং সহানুভূতিশীল মনে হলো। সে আমাকে এক মুহূর্ত দেরি না করে ক্লিনিকে চলে আসতে বলল। আমরা তিনজন দ্রুত জামাকাপড় বদলে ক্লিনিকে গিয়ে পৌঁছালাম।

যে ডাক্তার আমাকে দেখলেন, তিনি একজন মহিলা। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। চুলগুলো জট পাকিয়ে লোহার তারের মতো দেখাচ্ছে। কিন্তু সবকিছু মিলিয়ে তাকে আমার যথেষ্ট ভালো একজন মানুষ বলে মনে হলো। তিনি যখন রুমে ঢুকলেন, তখনো দুই বোন মিলে স্টেরিও স্পিকারের মতো বকবক করছিল। হাত দিয়ে একটা তালি মেরে তিনি কথা বলতে নিষেধ করলেন। এই একটা ঘটনাতেই তার প্রতি আমি মোটামুটি কৃতজ্ঞ হয়ে গেলাম। এরপর কানের চিকিৎসা না করলেও আমার কৃতজ্ঞতাবোধে কোনো ঘাটতি থাকত না।

ডাক্তার একটা চেয়ার টেনে আমার পাশে বসলেন। তাকে পুরো ঘটনাটা খুলে বললাম। তিনি খুবই বিরক্ত একটা চেহারা ধরে রেখে আমার পুরো কাহিনি শুনলেন। যে লোক নিজে কানে শুনতে পায় না সে মনে করে তার চারপাশের সবাই তার মতো কম শুনছে। সে কারণে আমি বোধ হয় একটু চিৎকার করেই কথা বলছিলাম। আমার সব কথা শোনার পর মহিলা বললেন, দয়া করে চিৎকার করে কথা বলা বন্ধ করো। আমি তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি।

তারপর তিনি একটা বড় সিরিঞ্জ হাতে তুলে নিলেন। সেটা সম্ভবত গরুর শরীরে ব্যবহার করা হয়। মানুষের শরীরে এ রকম বড় সিরিঞ্জ আমি ব্যবহার করতে দেখিনি। ঘাবড়ে গেলাম বেশ। এই জিনিস কানের মধ্যে ঢোকালে আমি মরে যাব। এর চেয়ে পালানো ভালো। বধির হয়ে হলেও বেঁচে থাকতে

আমি রাজি ছিলাম। তখনই স্বস্তির সঙ্গে খেয়াল করলাম, সিরিঞ্জের মাথায় সুইটা নেই। তার মানে এ যাত্রা বেঁচে থাকার আশা আছে।

মহিলা সিরিঞ্জের ভেতরে বাদামি রঙের একধরনের তরল ভরলেন। তিনি জিনিসটা আমার কানের ফুটোর কাছে নিয়ে ভেতরের তরলটুকু ঢেলে দিলেন। দুই কান মিলিয়ে তিনবার করে কাজটা করলেন। তারপর কিছু তুলো নিয়ে কান দুটো ভালো করে মুছে দিলেন। ততক্ষণে আমি আবার কানে শুনতে শুরু করেছি।

আমি শুনতে পাচ্ছি, বললাম আমি।

তোমার কানের পর্দার কাছে প্রচুর ময়লা জমে গিয়েছিল, তিনি বললেন।

স্টেরিও স্পিকার চালু হয়ে গেল। তারা ডান-বাম-ডান-বাম করে কথা বলতে শুরু করল :

কিন্তু আমরা ফ্লাশলাইট দিয়ে কানের ভেতরটা দেখেছি ভালো করে।

কোনো ময়লা খুঁজে পাইনি।

মহিলা বিরক্ত হয়ে বললেন, সেটা কানের কার্ভের কারণে।

কার্ভ? আমি বললাম।

আর দশটা মানুষের চেয়ে তোমার কানের ভেতরে কার্ভটা একটু বেশি, কথাটা বলে তিনি একটা দেশলাইয়ের বাক্সের ওপরে আমার কানের ভেতরের কার্ভটা এঁকে দেখালেন।

তারপর বললেন, এই যে বাঁকগুলো দেখছ, সেখানে যদি কোনো ময়লা একবার ঢুকে যায়, সেটা বের করা বেশ কঠিন। সারা দিন চেষ্টা করেও বের করতে পারবে না।

এর কি কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে? আমি হালকা রসিকতার সুরে বললাম।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বলতে?

মানে আমার কানের ভেতরে যে এ রকম অস্বাভাবিক একটা কার্ভ আছে, এটা কি মানসিকভাবে আমার মধ্যে কোনো সমস্যা তৈরি করতে পারে?

না, তিনি বেশ কড়া সুরে বললেন।

আমরা সোজা বাসায় না ফিরে গলফ কোর্সের মধ্য দিয়ে কিছুক্ষণ হাঁটলাম। ১১ নম্বর হোলের কাছে পথটা বেশ বেঁকে গেছে। একটা কার্ভ টের পাওয়া

যায়। সে পথে হাঁটতে গিয়ে ম্যাচবাক্সের ওপর আঁকা আমার কানের ভেতরের কার্ভের কথা মনে পড়ে গেল। হোলের কাছে মাটিতে একটা স্ট্যান্ডের মাথায় পতাকা গেড়ে রাখা। সে লাঠিটাকে কেন যেন মনে হলো কটন বার। দুই বোন মিলে এখুনি আমার কানের মধ্যে সেটা ঢোকাবে। এরপর যেন বাঁধ ভেঙে গেল। আমার মনে বিভিন্ন রকম উপমা আসতে শুরু করল। স্রোতের মতো ভেসে এল তারা। চাঁদের আলোয় ভেসে যাওয়া সাদা মেঘগুলোকে মনে হলো বি-৫২-এস ফাইটার জেট প্লেন। দূরের পাইনবনকে মনে হলো ভারী একটা পেপারওয়েট।

সে যা-ই হোক, কানে বেশ ভালো শুনতে পাচ্ছিলাম। যা শুনতে পাওয়ার কথা সেগুলো যেমন শুনছিলাম, যা শুনতে পাওয়ার কথা নয়, সেগুলোও শুনতে শুরু করলাম। মনে হচ্ছিল, শত শত মাইল দূরের শব্দ ভেসে আসছে আমার কানে। রাতের পাখির কান্না, দূরের বাড়িঘরের জানালা বন্ধ করার শব্দ, মানুষের না বলা ভালোবাসার কথা সব অশ্রুতপূর্ব শব্দ আমার কানে এসে পৌঁছাচ্ছিল।

কী বাঁচাটা বেঁচে গেলে! দুই বোনের একজন বলল।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও, অন্যজন প্রতিধ্বনি তুলল।

টেনেসি উইলিয়ামস একবার লিখেছিলেন, অতীত ও বর্তমানকে নিয়ে আমরা বলতে পারি, ‘জিনিসটা এভাবে ঘটেছে বা ঘটছে।’ ভবিষ্যৎকে নিয়ে লিখতে গেলে লিখতে হবে, ‘এভাবে ঘটতে পারে।’

আমি যখন পেছন ফিরে তাকাই, অতীতে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো নিয়ে সংশয়ের মেঘ দেখতে পাই। আমার লিখতে ইচ্ছে করে ‘সম্ভবত’। যেন ঘটনাগুলো সত্যিই আমার জীবনে ঘটেছে কি না সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই। একটা জিনিসই শুধু আমরা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারি, তা হলো আমাদের বর্তমান। আমরা বর্তমানের মুহূর্তটাতেই বেঁচে থাকি। এবং আফসোসের ব্যাপার সেই মুহূর্তটাও নিমেষে চলে যায়।

যমজ দুই বোনকে বিদায় জানানোর সময় আমার ঠিক এই কথাটাই মনে হয়েছিল।

তাদের বাসে তুলে দেওয়ার জন্য আমি বাসা থেকে বেরিয়েছিলাম। বাস স্টপটা আমার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেশি দূরে নয়। গলফ কোর্সের মধ্য দিয়ে হেঁটে গেলে বেশিক্ষণ লাগে না। পুরোটা পথ আমি কোনো কথা বলতে পারিনি।

স্পষ্ট মনে আছে, সেদিন ছিল রোববার। আকাশ একদম নীল রঙের। রোদ ঝলমল করছে। নভেম্বর মাসে এ রকম একটা দিন খুঁজে পাওয়া বেশ কঠিন।

পায়ের নিচের ঘাসগুলো আসন্ন মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছিল। কিছুদিনের মধ্যেই তুষারপাত শুরু হবে। সবুজ মাঠ বরফে সাদা হয়ে যাবে। তারপর শুরু হবে বরফ থেকে বেরিয়ে আসার অপেক্ষা। একসময় বসন্ত আসবে। ঘাসগুলো আবার নতুন করে জন্মাবে।

হাঁটতে হাঁটতেই দুই বোনের একজন বলল, তুমি কী ভাবছ?

কিছু না, আমি বললাম।

দুই বোন নতুন সোয়েটার পরেছিল। সেগুলো আমিই ওদের দিয়েছিলাম। ওদের ২০৮ এবং ২০৯ লেখা সোয়েট শার্ট দুটো ওরা একটা কাগজের ব্যাগে ভরে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে।

তোমরা কোথায় যাচ্ছ? আমি জানতে চাইলাম।

যেখান থেকে এসেছিলাম, তারা বলল।

হ্যাঁ। তারা যেখান থেকে এসেছিল, সেখানেই ফিরে যাবে। এটাই সবচেয়ে স্বাভাবিক ব্যাপার। তবে মানুষ হয়ে জন্মানোর একটা অসুবিধে হচ্ছে, আমরা স্বাভাবিক ব্যাপারগুলোই মেনে নিতে পারি না। খুব ধীরে ধীরে গলফ কোর্সের মধ্য দিয়ে তিনজন হাঁটছিলাম।

আমি জানি না কথাটা কী করে বলব, আমি বললাম, তোমরা দুজন চলে যাওয়ার পর আমি খুব একা হয়ে যাব। তোমাদের খুব মিস করব।

আমরাও তোমাকে খুব মিস করব, তাদের একজন বলল।

তোমাকে ছাড়া আমাদেরও খুব একা লাগবে, অন্যজন বলল।

তার পরও তোমাদের যেতেই হবে, তাই না?

তারা মাথা নাড়ল।

তোমরা আরেকটা বার ভেবে দেখো, যাবে কি না? তোমাদের কি আসলেই যাওয়ার মতো কোনো জায়গা আছে?

নিশ্চয়ই আছে।

অবশ্যই আছে। সে রকম জায়গা যদি আমাদের না থাকত, আমরা যেতাম না।

গলফ কোর্সের বেড়া ডিঙিয়ে অন্য পাশের রাস্তায় গিয়ে উঠলাম। সেখানেই বাসস্টপ। আমরা টিকিট কেটে বেঞ্চে বসলাম। রোববার বলে তেমন ভিড়

ছিল না। বাস আসা পর্যন্ত আমরা তিনজন বসে বসে বাচ্চাদের ওয়ার্ড-গেম খেললাম। একসময় বাস চলে এল।

আবার দেখা হবে, আমি বললাম।

আবার দেখা হবে, তারা উত্তর দিল।

'আবার দেখা হবে' শব্দগুলো আমার হৃদয়ের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে বাজল। যেন প্রতিধ্বনি তুলল। বাসের দরজাটা শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল। তারা জানালা দিয়ে হাত বের করে আমার দিকে হাত নাড়ল। আমি আমার ডান হাতটা কাঁধ পর্যন্ত তুললাম। বাসটা অনেক দূর চলে গেল। আমি সেভাবেই দাঁড়িয়ে রইলাম।

অনেকটা সময় পার হয়ে গেল। খেয়াল করলাম, হাতটা তখনো উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছি। লজ্জা পেয়ে সেটা পকেটে ঢোকালাম। অনেক দিন আগে অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের সেই লম্বা চুলের মেয়েটাকে ট্রেনে বিদায় দেওয়ার দৃশ্য ফিরে এল আমার মাথায়। সেদিনও এভাবেই বোকার মতো হাত উঁচু করে দাঁড়িয়ে ছিলাম। সবকিছু ফিরে ফিরে আসে।

বাসায় ফিরে কফি বানালাম। আজ আর আমাকে কফি বানিয়ে দেওয়ার কেউ নেই। রেকর্ড প্লেয়ারের টার্ন টেবিলে দুই বোনের রেখে যাওয়া রেকর্ডটা। বিটলসের 'রবার সোল' অ্যালবাম। সেটা চালিয়ে দিয়ে কফির মগ হাতে জানালার পাশে বসলাম।

শরতের নরম আলো আমার গায়ে এসে পড়ল, যেন ভিজিয়ে দিল। জানালা দিয়ে সারাটা দিন বাইরে তাকিয়ে রইলাম।

রোববারের স্তব্ধ একটা দিন, থেমে আছে যেন।

দুচোখ ভরে দেখলাম। সবকিছু থেকেই আশ্চর্য রকম শান্ত ও পরিষ্কার এক নভেম্বরের ঝলক টের পেলাম। বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

যমজ দুই বোনের চেহারা, কণ্ঠস্বর, চুল সব একরকম। শরীরে এমন কোনো তিল বা জন্মদাগ নেই যা দিয়ে তাদের আলাদা করা যেতে পারে। একটা উপায় একদিন পাওয়া গেল। তারা বাড়িতে নেভি ব্লু সোয়েটশার্ট পরত। সেখানে দুটো সংখ্যা লেখা ছিল। ২০৮ আর ২০৯। ডান পাশের নিপলের ওপরে '২' লেখা। বাম নিপলের ওপরে '৮' অথবা '৯'। দুই স্তনের ভাঁজে '০' চাপা পড়ে যেত। দুজনের দিকে আঙুল তুলে বললাম, এখন থেকে তোমাকে ২০৮ বলে ডাকব আর তোমাকে ডাকব ২০৯।

কিন্তু এভাবে তো তুমি আমাদের চিনতে পারবে না, ২০৮ বলল।

কেন?

দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে হাসল। ম্যাজিকের মতো শার্টদুটো বদলে নিল। তারপর ২০৯ আমার দিকে তাকিয়ে বলল, এখন আমি ২০৮।

আর আমি ২০৯, অন্যজন সুর মেলাল।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

Pinball, 1973
A novel by Haruki Murakami
Translated in Bengali by Alvi Ahmed

A Baatighar Publication

Cover Design
Sabyasachi Mistry
Price : BDT 300.00 USD : 15.00
facebook.com/BaatigharPUB

9 789849 533672